স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ৮ সেপ্টেম্বর - ২০১৪।। ২২ ভাদ্র - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

গত চার বছরে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় ৩০০ চা-শ্রমিকের মৃত্যু।

চা-বাগান বন্ধের কারণে গত চার বছরে বেকার হয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার মানুষ।

৬টি বড় চা-বাগান বন্ধ হয়েছে গত চার বছরে।

সঙ্কটাপন্ন উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২২ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৮ সেপ্টেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

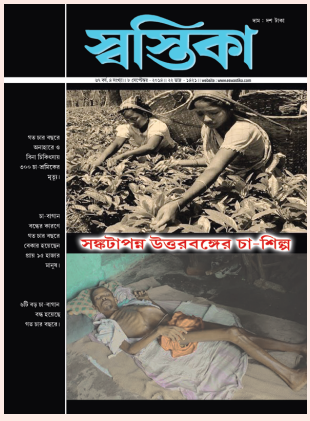

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : দলের নাম TMCPM নেত্রী কমরেড মমতা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

মমতার সরকার এখন চিটফান্ড সরকার নামেই বেশি পরিচিত ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

চা-শিল্পকে না বাঁচালে উত্তরবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে ▯ সৌমেন নাগ ▯ ১১

উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতির স্তম্ভ ইকোফ্রেন্ডলি চা-বাগিচা ▯ রাম অবতার শর্মা ▯ ১৯

বিকল্প জীবিকার স্বার্থে ক্ষুদ্র চা-চাষ ▯ ভীষ্মদেব মেধি ▯ ২৪

রাজনৈতিক নেতা ও বিচারকদের বিপজ্জনক জোটবন্ধন ▯ যোগীন্দর সিং ▯ ২৭

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে মোদী সরকার ▯ সাধন পাল▯ ২৯

বিজেপি-র মিশন-কাশ্মীর ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ২৬ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮▯

খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ সেপ্টেম্বর
২০১৪

প্রকাশিত হবে
১৫ সেপ্টেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পরিবেশ

বিশ্বের পরিবেশ আজ আক্রান্ত, ক্লেদাক্ত। চারদিকে তাকালেই বোঝা যায় বিশ্ব-উষ্ণায়ণ এখন আমাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। পরিবেশ দূষণ আজ প্রকৃতপক্ষে সভ্যতারই সঙ্কট। এই ভাবনা থেকেই এবার আমাদের বিশেষ বিষয়— পরিবেশ সঙ্কট ও ভারত। বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন বিকাশ ঘোষাল, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, মোহিত রায় প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

রাজনীতি না দুর্নীতিমুক্ত ভারত

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদাকাণ্ডের তদন্ত চলিতেছে। সেই তদন্তের ফলে অনেক সাধু সাজিয়া থাকা ব্যক্তিরও মুখোশ খুলিয়া যাইতেছে। সততার মুখোশ জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার ফলে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে অনেকে সমালোচনা করিতেছেন। এতদিন সকলেই জানিতেন যে বহু কিছু অপরাধের তদন্ত সিবিআই করিয়া থাকে। তদন্ত চলিতে বহুদিন সময় কাটিয়া যায় এবং কখনো কখনো মাঝপথে রাজনৈতিক প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনেও তদন্ত বানচাল হইয়া যায়। শাসকদলও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সিবিআইকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই কারণেও অনেক সময় তদন্ত ব্যাহত হইয়া থাকে। সবাই জানিত এইবারও একই ঘটনা ঘটিবে। সারদা কেলেঙ্কারির রথী-মহারথীরা জানিতেন যত তদন্তই হউক শেষ পর্যন্ত রফা হইয়া যাইবে, তাহাদের কিছুই হইবে না। এতদিনকার ঐতিহ্যে এইবারই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, কারণ এই প্রথম দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্র বলিতেছে, সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যত এক ধরনের শুদ্ধিকরণ অভিযান শুরু হইয়াছে। তাই সারদা মামলা ধামাচাপা দিবার জন্য রাজনৈতিক চাপ যতই আসুক সিবিআই তদন্তকে কোনো ভাবেই লঘু করা হইবে না। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নির্দেশ দিয়াছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যখন তদন্ত চলিতেছে, তখন কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেন ইহাতে হস্তক্ষেপ না করেন এবং কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেন সিবিআই প্রধানের সঙ্গে দেখাও না করেন। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়িবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন মোদী। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে তৎপর প্রধানমন্ত্রী। তাই নামজাদা শিল্পপতিকেও প্রধানমন্ত্রী রেয়াত করিতেছেন না। তবুও কেন সারদা তদন্তকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলা হইতেছে—ইহার উদ্দেশ্য কি? স্মরণে থাকা উচিত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়া সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত করানোর কাহারা বিরোধিতা করিয়াছিল? কাহারা সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করিয়া সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ আইনি লড়াই চালাইয়া ছিল? তাহারা সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করিয়াছিল কেন? কারণ তাহারা নিশ্চিত করিয়া জানিতেন সিবিআই তদন্ত হইলে অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বস্তুত সারদাকাণ্ডের মতো বিশাল আর্থিক কেলেঙ্কারির সহিত রাজনীতির নিবিড় যোগ আজ প্রকট হইতেছে এবং সেইসঙ্গে বহু নেতা-মন্ত্রীর সততার মুখোশ খুলিয়া যাইতেছে। এমনকী রাজ্যে সততার প্রতিভু বলিয়া যিনি পরিচিতা তাঁহারও স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে আজ কালির দাগ লাগিবার উপক্রম হইতেছে। এখন জানা যাইতেছে তিনি রেলমন্ত্রী থাকিবার কালেই রেলের সহিতও সারদার চুক্তি হয়। ২০১০-১১ সালের রেল বাজেটে 'ভারততীর্থ' ভ্রমণ প্রকল্পের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের অফিসিয়াল পার্টনার করা হইয়াছিল সারদা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসকে।

বস্তুতঃ সারদা কেলেঙ্কারির ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গে দুইটি রাজনৈতিক দল সংযুক্ত ছিল বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে এবং সেইজন্য সারদা তদন্ত অন্য ভাবে আটকাইতে দুই দলই সচেষ্ট। এখন বিজেপিকে আটকাইতে গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদের সংযুক্তিকরণের প্রস্তুতি চলিতেছে। এই সংযুক্তিকরণও কেবল সারদা তদন্তের কারণে। তবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার গল্প শুনাইয়া যে অপরাধীরা পার পাইয়া যাইবে সেই আশা বৃথা, কারণ কেন্দ্র সারদা তদন্ত লঘু করিবার চেষ্টা করিলে তিন মাসের সরকারের বদনাম হইবে, সুপ্রিম কোর্ট যদি সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হইয়া কোনো মন্তব্য করিয়া বসে তাহা হইলেও সরকারের অঙ্গে কালি লাগিবে। ইহা ছাড়া সততার বোরখা পরিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিবার দিন এইবার সত্যিই বিদায় লইয়াছে।

সুভাষিত

অষ্টৌগুণা পুরুষং দীপয়ন্তি, প্রজ্ঞা সুশীলত্ব দমৌ শ্রুতং চ।
পরাক্রমশ্চ মিতভাষিতা চ দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ।।

বুদ্ধি, সুন্দর চরিত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাহস, মিতভাষিতা, যথাশক্তি এবং কৃতজ্ঞতা—এই আটটি গুণ কোনো পুরুষকে সুশোভিত করে।

ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা তোলার অপরাধে অর্থনৈতিক ভাবে অবরুদ্ধ ছিটমহলের বাসিন্দারা

সাধন কুমার পাল : কোচবিহার॥ গত ২১ আগস্ট ওরা কোচবিহারের জেলা শাসককে স্মারক লিপির মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে এসেছিল। জেলাশাসককে ওরা স্পষ্ট করে দু'টো অভিযোগ জানিয়েছে। এক, ১৫ আগস্ট ভারত ভূমিতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা দিবস পালনে বাধা প্রদান। দুই, স্বাধীনতা দিবস পালনে ভারতীয়দের প্রতিহত করতে না পেরে পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা তুলে ওই দেশের জাতীয় দিবস পালন করে অবৈধ ভাবে জোরপূর্বক ভারতীয় ছিটমহল দাশিয়ারছড়া ছিট দখলের উদ্দেশ্যে পাল্টা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ভারতীয়দের অর্থনৈতিক ভাবে অবরুদ্ধ করার ফতোয়া।

হ্যাঁ, ওরা বলতে এখানে বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত দাশিয়ারছড়া ছিটমহলে বসবাসকারী প্রকৃত ভারতীয়দের কথা বলা হচ্ছে। এই ছিটমহলটির অফিসিয়াল ঠিকানা, ১৫০নং দাশিয়ার ছড়া, পোস্ট : থরাইথানা, থানা : দিনহাটা, জেলা : কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। এই ভূখণ্ডটির প্রকৃত অবস্থান বাংলাদেশের কুরিগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানা এলাকার মধ্যে।

১৪ আগস্ট দুপুর নাগাদ দাশিয়ার ছড়া ছিটমহলের বাসিন্দা প্রকৃত ভারতীয়দের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করতে দেওয়া হবে না বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে আগাম হুমকি দেওয়া হতে থাকে। ফুলবাড়ি থানা থেকে সুকুমার নামে বাংলাদেশি পুলিশের একজন সাব ইনস্পেক্টর ১৫ আগস্ট দাশিয়ার ছড়াতে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করলে ফল ভালো হবে না বলে শাসিয়ে আসে।

খবর পৌঁছয় এই প্রতিবেদকের কাছেও। যোগাযোগ করা হয় কোচবিহার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে। জেলা শাসক কথা দেন পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রতিবেদক যোগাযোগ করেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এস এস আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে। লোকসভার অধিবেশন চলার জন্য সাংসদ তখন দিল্লীতে। শ্রী আলুওয়ালিয়া কথা দেন তিনি বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশকে সতর্ক করার চেষ্টা করবেন। খবর যায় মিডিয়ার বিভিন্ন অংশে। ব্যাপারটি নিয়ে হইচই শুরু হওয়াতে বাংলাদেশ প্রশাসন এ ব্যাপারে অবৈধ নাক গলানোর পথ থেকে সরে আসে।

কিন্তু ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মইনুল হক ও ওই ছিটের একজন জবর দখলকারী আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে শতাধিক সশস্ত্র বাংলাদেশি সকাল নটা নাগাদ ওই ছিটে অনুপ্রবেশ করে স্বাধীনতা দিবস পালনকারীদের হুমকি ধমকি দিয়ে সেখানকার কালিরহাট বাজারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তুলে ওই দেশের জাতীয় সংগীত গেয়ে এলাকাটি বাংলাদেশের দখলে গেল বলে ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতেও দমে না গিয়ে ওই ছিটের প্রকৃত ভারতীয়রা ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সংগীত গেয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করে।

বাংলাদেশের মাটিতে থাকা ভারতীয় ছিটে বাসিন্দারা বাজারহাট থেকে শুরু করে নানা প্রয়োজনের জন্য বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। একইরকম ভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল ভারতের মাটিতে থাকা বাংলাদেশি ছিটের বাসিন্দারা। নানা হুমকিকে অগ্রাহ্য করে ১৫ আগস্ট দাশিয়ারছড়ার বাসিন্দারা নিজের দেশ ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করার পর তাদের উপর নেমে এসেছে অর্থনৈতিক অবরোধের খাঁড়া। নিজের দেশের জাতীয় পতাকা তোলার অপরাধে এই অসহায় ভারতীয়দের বাংলাদেশের হাটেবাজারে যেতে বারণ করা হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে প্রবেশ করলেই পাশপোর্ট আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

কোচবিহার তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধে অসুবিধে ও মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর মতো ন্যূনতম কাজটুকু করেছে বলে জানা যায়নি। স্বাধীনতার পর থেকে ব্রাত্য ভারতীয় ছিটের বাসিন্দারা আর ক'দিন ভারতীয় হয়ে থাকতে পারে এ যেন তারই পরীক্ষা!

নবকুমার ভট্টাচার্যের
দুর্গাপুজোর জোগাড় - ৬০্
দুর্গাপুজোর নিয়মকানুন - ৬০্
দুর্গোৎসব : বোধন থেকে বিসর্জন - ২০০্
প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণী
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বি এস এফের অভিযোগ—পাক রেঞ্জাররা সাহায্য করছে অনুপ্রবেশকারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাক রেঞ্জাররা অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললো বিএসএফ। সম্প্রতি উত্তর কাশ্মীরে দু'টি পৃথক এনকাউন্টারে চার জঙ্গি ও দুই নিরাপত্তারক্ষী মারা গিয়েছেন। জম্মুর নিয়ন্ত্রণ রেখা ও আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ইদানীং পাকিস্তান বারবার যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সীমা বল বা বিএসএফ অভিযোগ করছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে পাক-রেঞ্জাররা গোলাবর্ষণ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত রাখতে চাইছে। যার সুযোগে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতভূমিতে প্রবেশ করতে পারে। একইসঙ্গে রেঞ্জারদের পেছন থেকে মদত দেওয়ার জন্য পাক-সেনাবাহিনীকেও দোষারোপ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই রেঞ্জাররা হলেন পাকিস্তানের প্যারামিলিটারি শক্তি। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের তীর এদের দিকেই। বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল গত ২৪ আগস্ট দিল্লীতে জানান গত কয়েকদিনে অন্তত তিনটে ঘটনায় আন্তর্জাতিক সীমানার খুব কাছাকাছি সশস্ত্র জঙ্গিদের তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে গোলাবর্ষণ করে তাদের এদেশে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা হচ্ছিল। একই সঙ্গে তিনি জানান, যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ ও গোলাবর্ষণের ব্যাপারে ফ্ল্যাগ-মিটিং করতে চেয়ে বিএসএফ পাক-রেঞ্জারদের কাছে ক্রমাগত আবেদন জানালেও এখনও পর্যন্ত সীমান্তের ওপার থেকে সাড়া মেলেনি। গত ২৪ আগস্টই এই প্রতিবেদন লেখা অবধি শেষ অনুরোধটি পাক-রেঞ্জারদের কাছে যায়।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিএসএফও পাল্টা প্রত্যুত্তর দিতে বদ্ধপরিকর। এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরও তাদের কাছে 'সমুচিত জবাব' দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। বি এস এফ সূত্রে আরও খবর গভীর রাতে সশস্ত্র অবস্থায় সাধারণ পোষাকে আন্তর্জাতিক সীমানার কাছাকাছি কয়েকজনকে প্রায়শই ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। গুলি চালালে তারা পালায়। কিন্তু বি এস এফের সদাসর্তকিত নজর এড়িয়ে এ ব্যাপারে এখনও কোনো অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করছে না করেনি সে ব্যাপারে সন্দিহান খোদ সীমান্তরক্ষী কর্তারাই। তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছেন, পাকিস্তানের এই খেলা নতুন নয়। গত বছরও ঠিক এই সময় তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ আর গোলাবর্ষণ করে অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে ঢোকাতে পেরেছিল। কিন্তু গতবারের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি আলাদা। তৎকালীন সরকারের নরম মনোভাবের যে সুযোগ পাক-রেঞ্জার ও পাক-অনুপ্রবেশকারীরা নিতে পেরেছিল। এবার সরকার পাল্টানোর সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের মনোভাবও পাল্টায়। বর্তমানে বি এস এফ পাল্টা আক্রমণের রাস্তা নেওয়ায় অনুপ্রবেশকারীরা আপাতত গভীর সমস্যায়। সূত্রের খবর গত ১৬ আগস্ট থেকে পাক-রেঞ্জাররা অস্ত্রবিরতি চুক্তি ভাঙছে এবং অন্তত ২৫টি বি এস এফ পোস্ট তাদের আওতায় পড়ছে। এখন পর্যন্ত ভারতের দিক থেকে দুই নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৯। পাক মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী বি এস এফ পাল্টা গুলি চালানোয় পাঁচটি দুর্ঘটনায় ১৬ জন আহতের খবর পাওয়া গিয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে। বি এস এফের ডিজি এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। স্পষ্টই তাঁদের পাক-রেঞ্জারদের 'সমুচিত জবাব' দিতে বলায় তাঁরা 'যোগ্য প্রতি আক্রমণের' রাস্তাই বেছে নিয়েছেন। এতেই অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত পাকিস্তান অনেকটাই থমকেছে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

টি ও আই-কে বাত্রার নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম শিক্ষা-সংগঠন বিদ্যাভারতী (সরস্বতী শিশু মন্দির)-র প্রমুখ এবং শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনের পুরোধা দীননাথ বাত্রা (৮৫)-কে অপদস্থ করতে ভারতের সংবাদমাধ্যমের একাংশ, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিকরা সবরকম নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কোমর বেঁধে নেমেছে। সম্প্রতি শ্রী বাত্রার লেখা কয়েকটি বই গুজরাট সরকার তাদের রাজ্যে স্কুলগুলিতে 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে চালু করেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই বইগুলি লিখিত। সম্প্রতি দীননাথ বাত্রা 'দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-কে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। গত ২ আগস্ট, ২০১৪-তে ওই পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে মানহানিকর, অমর্যাদাকর ও উপহাসসূচক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এই নোটিশটি গত ৫ আগস্ট টাইমস-এর দপ্তরে পৌঁছয় বলে জানা গেছে। ওই নোটিশে দাবি করা হয়েছে, এইজন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় তা প্রকাশ করতে হবে।

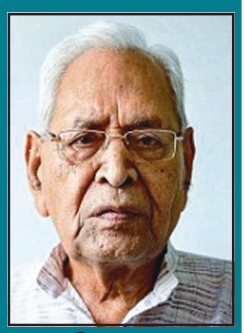

দীননাথ বাত্রা

ওই নোটিশে বাত্রা বলেছেন, "প্রকাশিত লেখাটিতে আমাকে মানহানিকর, অমর্যাদাকর, অপমানসূচক ও কলঙ্কিত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরো লেখাটিতে এমন সব বিষয় আমার লেখা বলে বলা হয়েছে যা বস্তুত আমি লিখিনি। ঘটনা হলো যে বইগুলি আমি লিখেছি তা সম্পূরক আকারে (Supplementary readings)। বইগুলি আবশ্যিক পাঠ্য নয়। বইগুলি প্রাসঙ্গিক (রেফারেন্স বুক) মাত্র।"

কলকাতায় আর এস এসের গুরু-পূজা অনুষ্ঠান

ভারত জেগেছে, বাংলা জাগছে : দত্তাত্রেয় হোসবালে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''এক সময় কথা ছিল, বাংলা জাগলে ভারত জাগবে। কিন্তু এখন ঠিক এর উলটোটা হয়েছে— ভারত জাগলে বাংলা জাগবে। এখন ভারত জেগেছে বাংলা জাগছে।'' —গত ৩১ আগস্ট কলকাতার কলামন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের গুরু দক্ষিণার সমারোপ অনুষ্ঠানে ঠিক এভাবেই কথাগুলি বললেন সঙ্ঘের সহ-কার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের জীবনমূল্যবোধকে ধরে রেখেছে গুরু পরম্পরা। এই গুরুর ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতায় নেই। গুরু নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের সাক্ষাৎকার ঘটান। গুরু জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান করান। আমি কে, কোথা হোতে এসেছি, কী চাই, আমার গন্তব্য কোথায়— এইসব উত্তর আমরা গুরুর কাছ থেকে উপলব্ধি করি। গুরুর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বিশ্বকে সভ্য করেছে। কলম্বাস আমেরিকায় গিয়ে সেখানের মূল অধিবাসীদের সব কিছু ধ্বংস করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দিগ্বিজয়ী বীর কম্বু আজকের কম্বোজ বা কম্বোডিয়ায় গিয়ে সেখানের মানুষকে সভ্য করেছেন। কম্বুর নামেই আজ কম্বোজ বা কম্বোডিয়ার পরিচিতি। ভারতের শিক্ষা ছিল কৃন্বন্ত বিশ্বমার্যম্। ভারতবর্ষের কেউ অস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিজয় করেননি, গুরুর শ্বাশতবাণী নিয়ে সারা বিশ্বে গিয়েছেন। অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকারও করেন।'' শ্রী দত্তাত্রেয় বলেন, ''ভারতবর্ষের হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে এই জীবন দর্শনকে পুষ্ট করেছেন, তাই এর নাম হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম বিশ্বমানবতার কথা বলেছে। হিন্দুধর্মই মানবধর্ম।''

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ভারতের কিছু কিছু মানুষের হিন্দু, হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্বের বিরোধিতা করাটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসাবে দক্ষিণ ভারতের একজন বিদ্বান বালগঙ্গাধর যিনি জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর উল্লেখ করেন। প্রথমদিকে তিনি কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁর মনোভাব এরকমই ছিল কিন্তু পরে ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে পড়াশুনা করে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং তিনি ভারতীয় দর্শনের অনুরাগী হয়ে পড়েন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের 'সহযোদ্ধা' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উপস্থিত স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আগে দুটো কর্তব্য সম্পর্কে সঙ্ঘকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। (১) ভারতবাসীর জাতিগত পরিচয় যে হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম বা দর্শন যে মানবধর্ম তা জোরের সঙ্গে বলতে হবে। (২) হিন্দু-ভাবনার ওপর আঘাতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বাইরের শত্রুদের, যেমন পাক-হামলাকারীদের আমরা চিনি, কিন্তু ঘরের শত্রুদের চিনতে ও চেনাতে হবে এবং হিন্দু ভাবনাকে আরো জাগিয়ে তুলতে হবে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গের সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস ও কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। কলামন্দির সভাগৃহে স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল। সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী পুরো অনুষ্ঠানই সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলায় স্বামী অসীমানন্দের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা উচ্চ আদালতে গত ২৮ আগস্ট সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ জামিন পেয়েছেন। অসীমানন্দ ও অন্য তিনজনের বিরুদ্ধে এই মামলায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (আই এন এ)-এর দায়ের করা মামলার শুনানি চলছে হরিয়ানার পঞ্চকুলাস্থিত বিশেষ আদালতে। স্বামী অসীমানন্দের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ১৮ আগস্ট হরিয়ানার পানিপথের কাছে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণে যুক্ত থাকার অভিযোগ আছে।

গত চার বছর আম্বালার জেলে বন্দী রয়েছেন স্বামী অসীমানন্দ। তাঁর কৌঁসুলি সিনিয়র আইনজীবী সত্যপাল জৈনের আবেদনের ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি এস এস সারোন ও বিচারপতি লিসা গিলের ডিভিশন বেঞ্চ।

অসীমানন্দ তাঁর জামিনের আবেদনে জানিয়েছিলেন ২০০৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রেলপুলিশের দায়ের করা এফ আই আর-এ তাঁর নাম না থাকা সত্ত্বেও দুই রেলযাত্রীর বয়ান অনুযায়ী উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১০ সালে আই এন এ-এর হাতে মামলাটি এলে সমস্ত অভিযুক্তের নাম বদল করে তাঁর নাম ঢোকানো হয়। তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি আইনজীবীর কাছে কোনো প্রমাণ নেই। উল্লেখ্য, আরো তিনটি মামলা তাঁর ওপর রয়েছে।

দলের নাম TMCPM, নেত্রী কমরেড মমতা

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস
তৃণমূল ভবন
তপসিয়া, কলকাতা
দিদি,

নতুন দল গঠনের আগে অভিনন্দন। আগেই বাম নেতৃত্বকে নবান্নে ডেকে ফিশফ্রাই-কফি সহযোগে আপ্যায়ন করে মিলনের বার্তা দিয়েছিলেন। এবার বাম চ্যানেলে (যদিও ব্যবসার টানে ইদানীং আপনার শরণাপন্ন) বসে সরাসরি সিপিএমকে তৃণমূলে মিশে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে দিলেন। কদিন আগেও যে সিপিএমের ভয়ে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত তাদেরকে গৃহপালিত করে ফেলার জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা।

তবে দিদি একটা কথা ঠিক যে, সিপিএমকে আপনি ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলেও হিরো থেকে জিরো বানিয়েছে কিন্তু বিজেপি। রাজ্যে একটা বিধানসভা আসনও পদ্মের দখলে নেই। তবু পদ্মই যেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। গোপনে বলছি দিদি, ইদানীং তো আমরা মনে হয় ওরাই শাসক দল। দেখুন যখন সিপিএমের নেতৃত্বে বাম দলেরা ক্ষমতায় ছিল তখন রাজ্যে আপনিই বারবার মহাজোটের ডাক দিয়েছেন। কংগ্রেস, বিজেপিকে নিয়ে মহাজোটও করেছেন রাজ্যের অনেক জায়গায়। আর যখন সত্যিই বামেদের গদিছাড়া করলেন তখন আপনার ভাষায় বিজেপি ললিপপ খাচ্ছিল। নাদান শিশু। কিন্তু এখন সিপিএম যে হিরো থেকে জিরো হয়ে গেছে তার জন্য কিন্তু পদ্মের অবদানই বেশি। গত লোকসভা ভোটের পর সিপিএমের ভোটব্যাঙ্কে যাকে বলে ডাকাতি হয়ে গেছে। আর তাতেই বিজেপি কোনো বিধানসভা আসন ছাড়াই রাজ্যের প্রধান প্রতিপক্ষ। একসময় সিপিএমকে রুখতে সবাইকে এক হতে হয়েছিল, আজ বিজেপিকে রুখতে সকলের এক হওয়া জরুরি। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের খবর বাম ভোটব্যাঙ্ক দখল করার পর বিজেপি থাবা বসাচ্ছে ঘাসফুলে। ২০১৬ সালের মধ্যে তাই সিপিএমের অবশিষ্ট সমর্থকদের ভোট ঘাসফুলের ঝুলিতে পুরতে না পারলে ঘোর দুঃসময় দেখতে হবে। আপনার সিদ্ধান্তের জবাব নেই দিদি!

মানুষের ভালো করার জন্য সত্যিই দিদি আপনি বন্ধু বদলাতে কসুর করেননি। কংগ্রেসকে ঠেকাতে এনডিএতে একাধিকবার ঢুকেছেন, বেরিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে কংগ্রেস বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। দিল্লীতে বিজেপি বন্ধু, রাজ্যে কংগ্রেস বন্ধু আবার, পুরুসভায় সবাই বন্ধু। আপনার মধ্যে এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি তা দেখার মতো, শেখার মতো।

আপনার এত যে দলবদল তা এদেশে নতুন নয়। লালুপ্রসাদ, মুলায়ম সিং, নীতিশকুমাররা এসবের এক একজন দিকপাল। কিন্তু তাদেরকেও হারিয়ে দিতে চলেছেন আপনি। কারণ, দিদি সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ঘর করবে এমনটা ভারতীয় রাজনীতি স্বপ্নেও ভাবেনি। ইস্, অনিল বিশ্বাস, জ্যোতি বসুরা দেখে যেতে পারলেন না!

একটা সময় আপনার মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে তরমুজ বলা হোত। কারণ, তিনি বাকি বাইরে বাইরে সবুজ দক্ষিণপন্থী হলেও ভিতরে ভিতরে লাল বামপন্থী। এরপরও কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিপিএমের বি-টিম বলে গালাগাল দিত। অর্থাৎ ভাবটা এমন যেন সিপিএমের ঘনিষ্ঠ হওয়া মানে এক গর্হিত কাজ। আপনি এই ব্যাপারটা খুব বেশি করে বিশ্বাস করতেন। তাই তো লাল রঙের প্রতি আপনার ঘৃণা কথায় কথায় প্রকাশ পেত। ক্ষমতায় আসার পরও যেখানে সুযোগ পেয়েছেন লাল মুছে নীল-সাদা করেছেন। কোনোদিনও প্রকাশ্যে বামপন্থীদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করেননি। আপনি সারা জীবনে যত তোপ দেগেছেন তার শতকরা নব্বই ভাগ ছিল বামেদের বিরুদ্ধে। এখন অবশ্য একশ ভাগ বিজেপি বিরোধিতা। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশই তো বড় উদাহরণ।

আপনার ভাইদের মুখে তো এই সেদিনও শোনা গেছে সিপিএম বিরোধিতার মহা মহা তোপ বাক্য। একজন তো বলেছেন, সিপিএম বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। একজন বলেছেন, সিপিএম কেউটে সাপের জাত। দেখলেই পিটিয়ে মারতে হবে। কারও মত ইঁদুরের মতো বিষ দিয়ে মারা উচিত।

কিন্তু এখন থেকে আর ওসব বলা যাবে না। কারণ, বিজেপি রুখতে হবে। ঠিক কথাই বলেছেন দিদি। বিজেপিকে রুখতেই হবে. অন্তত শেষ চেষ্টাটা করতে হবে। দিল্লীতে সম্ভব হয়নি। রাজ্যে অন্তত বিজেপিকে ঠেকাতেই হবে। যেভাবেই হোক। এক হুঁকোয় তামাক খেতে হবে। জাত যায় যাক। গদি যেন না যায়। মা-মাটি-সারদা সরি মানুষের শপথ নিয়ে বলছি বাংলায় পদ্ম চাষ রুখতেই হবে।

— **সুন্দর মৌলিক**

মমতার সরকার এখন চিটফান্ড সরকার নামেই বেশি পরিচিত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে মুখে এখন আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। আমি নিশ্চিত যে আপনারা সকলেই টিভির পর্দায় মুখ্যমন্ত্রীর রাগী মুখের ছবি দেখেছেন ও দেখছেন। তিনি কথা বলছেন না ঝগড়া করছেন বোঝা দায়। আতঙ্ক থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর এই রাগ। তিনটি কারণে তাঁর এই রাগী পরিবর্তন। প্রথম কারণ, সারদাকাণ্ডে তাঁর দলের পাণ্ডারা চিটফান্ডের কয়েক শত কোটি টাকা লুটেপুটে খেয়েছে সেই সত্যটিকে আর ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না। সিবিআই তদন্তের যে সামান্য অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতেই রাজ্যের মানুষ বুঝেছেন গরিব মানুষের টাকা কারা লুঠ করেছে। আদালতের বিচারে অভিযুক্তদের শাস্তি পাওয়ার আগেই মানুষের আদালতে তৃণমূলের মাথারা অপরাধী বলে ঘোষিত হয়েছে। এখন গরম গরম কথা বলেও মানুষকে বোঝানো যাচ্ছে না যে রাজ্যের দিদি সততার প্রতীক। সারদার কমপক্ষে ৪০০ কোটি টাকা কোথায় গেল তার জবাব রাজ্যের সাধারণ মানুষ পেয়ে গেছেন। দিদি এই পরম সত্যটি বুঝেছেন যে শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা দেওয়া যাবে না। তাই তিনি ক্ষিপ্ত। আর তাঁর রাগী চেহারার ছবি রোজই ধরা পড়ছে টিভির পর্দায়। মমতা এতকাল সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ছিলেন টলিউডের শিল্পীদের সঙ্গে। সেখানেও এখন অশনি সঙ্কেত। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের লোক হিসেবে টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায় পরিচিত মুখ প্রযোজক শ্যামসুন্দর দে মশাইকে দেশের অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সেবি সম্প্রতি নোটিশ ধরিয়েছে। তিনি 'গ্রিনটাচ প্রোজেক্টস' নামে একটি চিটফান্ডের ব্যবসা দেশের কোম্পানি আইন এবং সেবি নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে চালাচ্ছেন, ঠিক যেভাবে সারদার মালিক সুদীপ্ত সেন তাঁর কারবার চালাতেন। মমতার সরকার এখন চিটফান্ড সরকার নামেই বেশি পরিচিত।

মমতার আতঙ্কের দ্বিতীয় কারণ, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনের লড়াইতে বিজেপি এবার তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মুসলমান ভোটদাতারা গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকেই সমর্থন করেছিলেন। এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তার পুনরাবৃত্তি হবে না এমন কথা মমতা বলতে পারছেন না। তৃণমূল নেতৃত্ব ধরেই নিয়েছেন যে বসিরহাট দক্ষিণে তাঁদের দলীয় প্রার্থী হারছে। তাই তৃণমূল সর্বশক্তি দিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের

গূঢ়পুরুষের

কলম

উপনির্বাচনে ঝাঁপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এই কেন্দ্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিজেপি যাতে বড়সড় জনসভা করতে না পারে নবান্ন থেকে লালবাজারে সেই নির্দেশ গেছে। যেভাবেই হোক বিজেপিকে আটকাও, এটাই এখন দিদির নির্দেশ। দিদি এখন বিজেপি আতঙ্কে ভুগছেন। সেই আতঙ্কিত মুখের ছবিই আপনারা টিভির পর্দায় দেখছেন।

দিদির রাগের তৃতীয় কারণ, দলের ছন্নছাড়া বেলাগাম অবস্থা। রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূলের গোষ্ঠী লড়াই এখন আর গোপন নেই। তোলাবাজির বখরা নিয়ে বোমাবাজি নিত্যদিনের ঘটনা। টাকার গন্ধ না পেলে দলের কর্মীরা পথে নামতে নারাজ। মুকুল রায়ের সাধ্য নেই দলের গোষ্ঠী লড়াইয়ের সামাল দেওয়ার। চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই এখন গলার কাঁটা তৃণমূল নেতৃত্বের। মুকুলবাবু বুঝেছেন যে কোনো একটি গোষ্ঠীকে নির্বচনী প্রচারে নামালে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য গোষ্ঠী চুপচাপ কমলে ছাপ দেবেই। আতঙ্কে দিদি তাই বিহারের নীতীশ-লালু জোটের ফর্মুলায় চৌরঙ্গীতে সিপিএমের সঙ্গে জোটের বার্তা দিয়েছেন। এতকাল বাংলা টিভি সংবাদচ্যানেল ২৪ ঘণ্টাকে দিদি সিপিএমের চ্যানেল বলে তাঁর কালো তালিকায় রেখেছিলেন। নেহরুর হিন্দি-চিনি ভাই ভাই শ্লোগানের নকল করে তৃণমূল-সিপিএম ভাইবোন বার্তা দিতে দিদি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিককে নবান্নে ডেকে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দিয়েছেন। স্পষ্ট বলেছেন, বিজেপিকে ঠেকাতে সিপিএমের হাত ধরতে চান। অথচ সিপিএম বিরোধী রাজনীতি করেই তিনি জননেত্রী হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এই মমতাই একদা সিপিএমকে বাংলা ছাড়া করার শপথ নিয়েছিলেন। এমন নেত্রীকে রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করবেন কীভাবে? তবে সিপিএমের হাত ধরতে চেয়ে তিনি বিপদে ফেলেছেন বিমান-বুদ্ধ-সূর্যকান্তদের। তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে দলেরই নীচুতলার কর্মীদের মনে। কর্মীরা মনে করছেন দলের রাজ্য নেতাদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করা হয়েছে। তাই চৌরঙ্গী এবং বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে বিমানবাবুরা গা ঘামাচ্ছেন না। তাঁরা এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করছেন। রাজ্যজুড়ে সিপিএম কর্মীরা মার খাচ্ছেন। খুন হচ্ছেন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে। বিজেপির হাতে নয়। এই রাজ্যে তৃণমূলই সিপিএমের প্রধান রাজনৈতিক শত্রু। এতকাল এটাই কর্মীরা জেনে এসেছেন। এখন সিপিএম-তৃণমূল ভাইবোন মেনে নেওয়াটা যায় না। অবাক হবেন না আলিমুদ্দিনের মাথাদের সবক্ শেখাতে নিচুতলার সিপিএম সমর্থক কর্মীরা চুপচাপ পদ্মফুলে ছাপ দিলে। বিহারে নীতীশ-লালুর জাতপাতের লড়াই ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-তৃণমূলের লড়াইটা রাজনৈতিক লড়াই। ইডিওলজির লড়াই। বামেদের চোখে বিজেপি এবং তৃণমূল দুটি দলই প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী দল।

এমন দলের সঙ্গে সিপিএম সমঝোতা করলে কর্মীরা মেনে নেবে না। সিপিএমের সঙ্গে জোট গড়তে চেয়ে মমতা ভোটের আগেই বাম শিবিরে ফাটল ধরালেন। একই সঙ্গে তাঁর নিজের মেকি সিপিএম বিরোধিতাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। মানুষ আর দিদিকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

চা-শিল্পকে না বাঁচালে উত্তরবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে

সৌমেন নাগ

'দু'টি পাতা আর একটি কুঁড়ি'— তরল সবুজ সোনার ঢেউ উত্তরবঙ্গের তরাই থেকে ডুয়ার্সের সীমা ছাড়িয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যে ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে সেই ইতিহাস আর উত্তরবঙ্গ তথা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইতিহাস পৃথক ভাবে দেখার সুযোগ নেই। এই দুটি পাতা আর একটা কুঁড়ির মধ্যে আছে একদিকে চা-এর পেয়ালায় মনমাতান ঘ্রাণের আমেজ, অপর দিকে এর পাতায় পাতায় জড়িয়ে আছে সুদীর্ঘকালের ঘাম, রক্ত ও জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগ এবং ব্রহ্মপুত্রের ইতিহাস জানতে হলে জানতে হয় চা বাগিচার ইতিহাস। উঁকি দিতে হয় চা সাম্রাজ্যের সেই ঘরে যেখানে প্রাচুর্যের পাশাপাশি আছে হাসির পরিবর্তে কান্না, ভাতের ঘ্রাণের পরিবর্তে শূন্য পাকস্থলীর অন্তঃক্ষরণের কটু স্বাদ। জীবনের গানের পরিবর্তে 'রাম নাম সৎ হ্যায়'-এর করুণ মৃত্যু মিছিলের ধ্বনি। অথচ এমন হবার কথা ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজতন্ত্রী জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় ত্রিশ বছরের রাজত্বে এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রী সিপিএম-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্টের নিরবিচ্ছিন্ন ৩৪ বছরের শাসনে চা সাম্রাজ্যে এমন হাহাকারের মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে এই এলাকার বাতাস এমন ভারী হওয়ার কথা ছিল না।

চা-শিল্পের গোড়াপত্তনের কথা :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তনের প্রায় ২৪.৬২ শতাংশ এবং লোকসংখ্যার প্রায় ১৯ শতাংশ নিয়ে আজকের এই উত্তরবঙ্গ। শিল্পবন্ধ্যা উত্তরবঙ্গের অহল্যাভূমিতে শিল্পের পদস্পর্শ বলতে একমাত্র চা-শিল্প। এখানে চা-বাগানের সংখ্যা প্রায় ৪০০। এর মধ্যে দার্জিলিং-এ ১০০, জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে ২৫০ এবং তরাই এলাকায় প্রায় ৫০। এই ৪০০টি চা-বাগানের মধ্যে বেশ কয়েকটি চা-বাগান বন্ধ। কর্মহীন শ্রমিকের মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর পদধ্বনি। এর মধ্যেই আবার

সমতলের ধানি জমিতে রাতারাতি ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপনের যে উন্মাদনা তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের প্রশ্নে কি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে— তা নিয়ে বিগত বামফ্রন্ট সরকার যেমন ভাবার প্রয়োজন অনুভব করেনি তেমনি বর্তমানের তৃণমূল সরকারও ভাবতে চাইছে না।

ভারতের চা-শিল্পের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নাম অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের একচেটিয়া অধিকারকে খর্ব করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা উৎপাদনের বিকল্প দেশের খোঁজে ছিল। ভারতে কোম্পানি শাসনের দায়িত্ব নিয়ে এসে তিনি ১৭৭৬ সালে স্যার জোসেফ ব্যাকস নামে এক উদ্ভিদ বিজ্ঞানীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশে চা চাষ সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে। তিনি তার পরীক্ষায় জানিয়ে দেন ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতে বিশাল এলাকা চা-চাষের পক্ষে সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই সময় কাকতালীয় ভাবেই আবিষ্কৃত হলো অসমের বনভূমিতে প্রাকৃতিক ভাবেই প্রচুর চা-গাছ জন্মায়। চরিত্রগত বিচারে এই চা-গাছগুলি চীনা চা-গাছের সমগোত্রীয়। অর্থাৎ বলা যায় চা-গাছ ভারতেরই নিজস্ব।

অসমের বনভূমিতে চা-গাছের আবিষ্কার যে শুধু এদেশে চা-বাগিচা শিল্পের জন্ম দিয়েছিল তা নয়, এই আবিষ্কার উত্তর পূর্ব ভারতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ

রাজনৈতিক তাৎপর্য এনে দিয়েছিল। ঘন জঙ্গল ঘেরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাটি রাজস্ব আদায়ের প্রশ্নে কোম্পানি শাসকের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। ১৮১৭-১৮২৪-এর মধ্যে বর্মার আক্রমণকে কেন্দ্র করে এখানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলতে গেলে নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই অঞ্চলটি ১৮২৬ সালে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে নিম্ন অসমের কামরূপ এবং দরং জেলার একটা অংশ এরা তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ১৮২৮ সালে আপার অসম থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ টাকা। আপার অসমে এই চা আবিষ্কারের পর কোম্পানির ভাবনা রাতারাতি পাল্টে যায়। তারা বুঝতে পারে এই অসম তাদের এতদিন ধরে খুঁজে আসা সবুজ তরল সোনার খনি চা-বাগিচা তাদের বাণিজ্যের গতিতে জোয়ার এনে দেবে। ১৮৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বর্ণময় সম্ভাবনার কথা ভেবে সমগ্র অসমকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

ভারতের মাটিতে চা-গাছের এই আবিষ্কারের ইতিহাসে দুটি নাম অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। একজন এ এ ব্রুস এবং অপর জন লেফটেনেন্ট চার্লটন। এই আবিষ্কারের ফলে চা-ব্যবসায় নিজেদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে কোম্পানি প্রবল উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৮৩৮ সালে ১২টি চা চেষ্টে ৩৫০ পাউন্ড চা কলকাতা বন্দর থেকে লন্ডনের চা নিলাম কেন্দ্রে পাঠানোর মাধ্যমে কোম্পানি তাদের চা বাণিজ্যের সূত্রপাত করে। ভারতীয় চা ঘ্রাণে এবং গাঢ়তার জন্য প্রথম আবির্ভাবেই বৃটেনের চা-প্রেমিকদের মন জয় করে নেয়। সে দিনটা ছিল ১৮৩৯ সালের ১০ জানুয়ারি।

১৮৩৯ সালে গঠিত হয়েছিল 'টি অ্যাসোসিয়েশন' এবং এর পর পরই জন্ম নিল 'অসম টি কোম্পানি'। ১৮৬১ সালের মধ্যে উৎপাদন দাঁড়াল ১.২৫ মিলিয়ন পাউন্ড। লন্ডনের বাজারে ভারতের চা-এর জনপ্রিয়তা দেখে ইংরেজরা আমেরিকার সেই সোনা দখলের অভিযানের মতন ভারতে চা-বাগিচা স্থাপনের জন্য ভিড় করতে শুরু করেছিল।

১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬ এই আট বছর ধরে চলল চা-বাগানের মালিক হবার উদ্দীপনা। চা-বাগান স্থাপনের নামে গড়ে উঠল অনেক ভুঁইফোঁড় সংস্থা। অস্তিত্বহীন বাগানের নামেও হয়ে চলল শেয়ার বিক্রি। কিছুদিনের মধ্যে বুদবুদ ফেটে যাওয়ার মতন চা- বাগানের এই শেয়ারের উদ্দীপনা থেমে গেল। ১৮৬৬ সালে লন্ডনের শেয়ার বাজারে নেমে এল ধস। এর প্রভাব এসে পড়ল চা-বাগিচা শিল্পের ফাটকা বাজিতে। তবে এতে ভারতের চা-বাগিচা শিল্পের মঙ্গল হয়েছিল। এরপর বহু চা-কোম্পানিকে তাদের ঝাঁপি বন্ধ করে দিতে হলো বটে কিন্তু কলকাতা ও লন্ডনের আর্থিক দিক থেকে রুগ্ন ও চা-শিল্পের ফাটকাবাজেরা সরে পড়তে বাধ্য হলো।

আন্তর্জাতিক চা-বাজার থেকে চীনের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে হটিয়ে সেই সিংহাসন দখল করার যে লক্ষ্য নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে এদেশে চা-শিল্প সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা সফল হয়েছিল। ১৯৮০ সালের মধ্যেই উত্তর পূর্ব ভারত (দার্জিলিং- অসম) ২ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে চা চাষ শুরু হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে চীন থেকে চা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯৮ মিলিয়ন পাউন্ড আর ভারতের পরিমাণ ছিল ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৮৮১ সালে ভারত থেকে চা রপ্তানির পরিমাণ হলো ৯৬ মিলিয়ন পাউন্ড আর ওই সময়ে চীন থেকে রপ্তানির পরিমাণ হলো ৬১ মিলিয়ন পাউন্ড।

উত্তরবঙ্গে চা-শিল্প সাম্রাজ্য :

আজকের ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং শৈল শহর বাদ দিয়ে তার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে 'মিশরকে নীল নদের দানের' মতন বলা যায় চা-শিল্পের অবদান। এই প্রসঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজপুরুষ ডাঃ ক্যাম্বেলের নামকে স্বীকার করে নিতে হয়। ১৮৪১ সালে ডাঃ ক্যাম্বেল চীন থেকে চা গাছের চারা এনে ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় দার্জিলিং-এ ছাদের টবে লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন এই মাটি ও জলবায়ুতে এই চারা গাছগুলি বাঁচে কিনা। পরীক্ষার ফল হলো আশাতীত।

দার্জিলিং-এর সিভিল সার্জেন্ট এবং মেজর গ্রামলিন লেবং যে চা-গাছ রোপণ করেছিলেন তাকেই বলা যেতে পারে দার্জিলিং-এর চা শিল্পের সূচনা এবং একই সঙ্গে জয়যাত্রা।

কি অসীম ক্ষমতা এই চা গাছের। মানুষের শাসনে শৃঙ্খলিত না হলে এই গাছটি দৈর্ঘে ত্রিশ ফুট উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারে। মানুষ তাদের প্রয়োজনে দুটি পাতা ও একটা কুঁড়ির 'সবুজ সোনাকে' ঝুড়িতে ভরতে এর উচ্চতাকে তিন ফুটের ঝোপে নামিয়ে এনেছে। এই উচ্চতার বাইরে মাথা বাড়াতে গেলেই তার মাথা কাটা পড়ে।

লেবং-এর সাফল্য চা-সাম্রাজ্যের বিজয়পতাকাকে বহন করে পাংথাবারি হয়ে কার্শিয়াং বিজনবাড়ি পার হয়ে তাদের জয়যাত্রা তিনধারিয়া ধরে নেমে এল সমতলে। তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড়ে কয়েক বছরের মধ্যে গড়ে উঠল ১০০টিরও বেশি চা-বাগিচা।

দার্জিলিং জেলা ছিল নন রেগুলেটেড জেলা। এখানে বাংলার অন্য জেলাগুলির মতন ভূমি আইন যে দার্জিলিং-ডুয়ার্স এলাকায় চালু করা হয়নি তার অন্য প্রধান কারণ এই চা-বাগিচা। চা-বাগিচার জন্য প্রয়োজন প্রচুর জমি। ১৮৫৯ সালে চালু হয়েছিল ওয়েস্ট ল্যান্ড রুলস। এই আইনে পতিত জমি ঘোষণা করে সেই জমিকে চা-বাগান স্থাপনের জন্য চা-মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হোত। জমির ন্যূনতম দাম ছিল একর প্রতি ১০ টাকা। নিলামের মাধ্যমে জমি বণ্টনের কথা বলা হলেও কোনো জমির দাম একর প্রতি ১২ টাকার বেশি ওঠেনি। মালিকেরা বলতে গেলে বিনা মূল্যেই এই জমি পেয়েছিল। নিলামে দামের এই ঊর্ধ্বডাকের সীমা থেকে বোঝা যায় চা জমি মালিকেরা আজকের ঠিকাদার সংস্থার সিন্ডিকেট গড়ার মতন তারাও সিন্ডিকেট গড়ে এই নিলামে অংশ নিত। একজন ডাকলে আরেকজন তাতে প্রতিবন্ধকতা

করত না। ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদেরই স্বজাতি সাদা চামড়ার এই সব চা-করদের সমর্থন জানাত।

এই সুযোগে প্রকৃত চা-বাগান মালিক ছাড়াও বহু ফাটকাবাজ দল চা-বাগিচার নামে এই নামমাত্র মূল্যে জমি হস্তগত করতে শুরু করেছিল। ফলে তিস্তার পশ্চিমে পাড়ে আর কোনো জমি চা-বাগানের জন্য পড়ে থাকল না। তাই চা-বাগানের অভিযান শুরু হলো সমতলে।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। চা-বাগিচা স্থাপনের এই উন্মাদনা কেন্দ্রীভূত ছিল তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড় ধরে। অথচ তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড় কালিম্পং একই ভৌগোলিক পরিবেশের অধিকারী হলেও সেখানে কিন্তু চা-বাগিচা স্থাপনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলো না। এর কারণ দুটি (১) এই এলাকাটি ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনে ভুটানের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে (অবশ্যই যুদ্ধে পরাজিত ভুটানের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি অনুসারে) ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল ১৮৬০ দশকের শেষ দিকে। এখানকার অধিবাসী ভুটানি ও লেপ্চরা ছিল সম্পূর্ণ কৃষিজীবী। (২) ইংরেজ শাসক ও সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে প্রয়োজন ছিল স্থানীয় এক কৃষি এলাকা। সেখান থেকে তারা সংগ্রহ করতে পারবে খাদ্যশস্য ও টাটকা সবজি। তাই কৃষিপ্রধান কালিম্পংকে তারা কৃষি উৎপাদনের জন্যই রাখতে উৎসাহী ছিল।

ভুটান-ডুয়ার্স নিয়েও ইংরেজ কোম্পানির একই মনোভাব ছিল। ঘন জঙ্গলে ঢাকা রাজস্বের প্রশ্নে এই এলাকাটি তাদের লাভজনক বলে মনে হয়নি। ১৭৭৫ সালে জি বোগলকে ওয়ারেন হেস্টিংস যে চিঠি লিখেছিলেন সেখানে সেই মনোভাব স্পষ্ট। তিনি লিখেছিলেন, "এই অঞ্চল এত দরিদ্র যে একে জয় করার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, এই অঞ্চল থেকে যে রাজস্ব আয় হবে তা শাসন ব্যয় থেকে বেশি।"

ডুয়ার্সকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার পেছনে যে কারণটা ছিল তা হলো, তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানি অনেকদিন থেকেই বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে চলেছিল। তিব্বতীদের চা পানে আগ্রহ দেখে কোম্পানি শাসকেরা চা-কে এই বাণিজ্য স্থাপনের মাধ্যম করতে চেয়েছিল। তারা তাই মনে করেছিল ডুয়ার্সের বনভূমি পরিষ্কার করে এখানে চা-বাগিচা করতে পারলে তিব্বতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের পথ খুলে যাবে। ভুটানের সঙ্গে এক যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসকেরা ডুয়ার্স এলাকা তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পশ্চিম ডুয়ার্স নামে একটা জেলা গঠন করেছিল। এর সদর দপ্তর হয়েছিল আজকের ময়নাগুড়ি। ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করে পশ্চিম ডুয়ার্সকে এই নতুন জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জেলাকে দুটো প্রশাসনিক ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। মাল, মেটেলি, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি এবং ধুপগুড়ি নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর সাবডিভিশন। অপরদিকে ফালাকাটা, কালচিনি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রামকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার সাবডিভিশন। এখানে চালু করা হয়। 'Waste Land Suitalde For Tea Act'।

চা-বাগান নিয়ে আলোচনায় এই অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। কারণ, এই অঞ্চলের রূপান্তরের পেছনে আছে চা-বাগিচা শিল্পের এক বিরাট ভূমিকা। ডুয়ার্স এলাকায় ময়নাগুড়ি-লাটাগুড়ি থেকে মাল, চালসা, বানারহাট, বীরপাড়া প্রভৃতি ২৯টি শহর গড়ে উঠেছে এই চা-বাগিচাকে কেন্দ্র করে। পশ্চিম ডুয়ার্সে ড. ব্রুহাম গাজোলডোবায় যে প্রথম চা-বাগান স্থাপন করেছিলেন তার অস্তিত্ব আজ আর নেই। তিস্তার গতিপথের পরিবর্তনের ফলে সেটি তার গর্তে তলিয়ে গেছে। এখান থেকেই সারা ডুয়ার্স জুড়ে চা-বাগিচার জয়যাত্রা। যা ছিল গ্রাম তা হলো গঞ্জ। গঞ্জ হলো শহর। জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটল দ্রুত হারে। খাস বা পতিত জমির সীমা চা-বাগিচাকে ধরে রাখতে পারল না। চিরাচরিত কৃষি জমিতে ঘটে চলল তার দ্রুত অনুপ্রবেশ। ঘটে চলল এই এলাকার অর্থনীতির পরিবর্তনের পাশাপাশি এখানকার জনবিন্যাসের পরিবর্তন ও পরিবেশের ভয়াবহ বিনাশ।

চা-বাগিচার মালিকানার চরিত্র দু' রকমের। ব্যক্তি মালিকানা আর লিমিটেড কোম্পানি। লিমিটেড কোম্পানিও আবার দু' রকমের। রুপি কোম্পানি এবং স্টার্লিং

> "উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে যারা মৃত্যুর বীজ বপন করে চলেছে তারা কিন্তু চা-শিল্পপতি হতে পারে না। এরা লুঠ করে চলেছে চা-শিল্পকে। এরা হত্যা করতে চাইছে উত্তরবঙ্গের প্রাণস্পন্দনকে। ধুঁকছে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি, মরছে চা-শ্রমিক। ধ্বংসের খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে সবার ভবিষ্যৎ। এই শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।"

কোম্পানি। যেগুলির রেজিস্ট্রেশন হোত ভারতে সেগুলি রুপি কোম্পানি আর যাদের রেজিস্ট্রেশন হোত ইংল্যান্ডে সেগুলি স্টার্লিং কোম্পানি। বাগানগুলির অধিকাংশ মালিকই ছিল বৃটিশ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা কিছু চা-বাগান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে যে দুজনের নাম প্রথমেই বলতে হয়, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কুমিল্লা থেকে আগত রহিম বক্স, অপরজন যশোরের বিহারীলাল গাঙ্গুলি। প্রথমজন ছিলেন আদালতের পেশকার, দ্বিতীয়জন ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী। প্রথম দিকে ভারতীয়রা জমি পেতে নানা বাধা নিষেধের সম্মুখীন হোত। পরে এই বাধা দূর হলে জলপাইগুড়ি শহরের ব্যবসায়ী এবং উকিলবাবুরা চা-বাগান স্থাপনে এগিয়ে আসেন। দার্জিলিং-এ যারা চা-বাগানে উদ্যোগী হয়েছিলেন এরা ছিলেন মূলত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য কৃষিজীবী। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই এরা প্রায় কেউই টি-প্ল্যান্টার্স ছিলেন না।

ডুয়ার্স ও তরাই এলাকায় বাঙালিরা চা-বাগিচা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। তাদের মালিকানায় গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি চা-বাগান। আজ সেই বাঙালি মালিকানার হাত থেকে প্রায় সবকটাই চলে গেছে। অতি সম্প্রতি তরাই-এর বাঙালি মালিকানা বলতে গেলে শেষ শিব রাত্রির সলতে কিরণচন্দ্র টি স্টেটও হস্তান্তর হয়ে গেল। প্রশ্নটা কোনো প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে নয়, জানতে হবে এর কারণ কি।

ডুয়ার্স এবং তরাই-এর মূলত বাঙালি মালিকানার চা- বাগানগুলিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি শহর প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল। এই শহরে ছিল প্রায় ৭০টি চা-বাগানের সদর দপ্তর। এই দপ্তরগুলি শুধু যে এখানকার স্থানীয় যুবকদের প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিত তা নয়, একে কেন্দ্র করে অ-প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ ছিল। মালিকানা হস্তান্তরের ফলে এই শহর থেকে ৬০টির মতন চা-বাগানের দপ্তর স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতায়। ফলে একদা কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর জলপাইগুড়ি শহর ও জেলা অতীতের ভগ্নাবশেষের মতো এক মুমূর্ষু শহরে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র।

চা-বাগিচার ইতিহাস ঘাম, রক্ত ও কান্নারও ইতিহাস :

চা শিল্পের মানচিত্রে জায়গা পেলেও এটি যন্ত্রনির্ভর শিল্প নয়। এটি শ্রমনির্ভর শিল্প। এটি বাগিচা শিল্প। পৃথিবীর বাগিচা শিল্পের যে ইতিহাস সেই একই ইতিহাসের প্রতিফলন এই চা-বাগিচা শিল্পেও।

এখানকার শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমিকে পরিষ্কার করে চা-বাগিচা শিল্পের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বাইরে থেকে আনতে হয়েছিল এমন সব মানুষকে যারা হুকুম তালিম করতে জানবে কিন্তু প্রশ্ন করার অধিকার থাকবে না। অহল্যামাটির ঘুম ভাঙাতে এরা দলে দলে দধীচির মতন নিজেদের বুকের হাড় দান করতে জানে কিন্তু সেই দানের ফসলের অধিকারকে দাবি করতে জানে না। চা-বাগিচার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন শ্রমিকের। স্থানীয় রাজবংশী জনজাতির কেউ এই কাজে যোগ দেয়নি। তাই অন্য বাগিচা ইতিহাসের মতন এখানেও আনতে হয়েছিল বাইরে থেকে শ্রমিক।

এদেশে চা-বাগিচার গোড়াপত্তন হয়েছিল অসমে। ঘন জঙ্গলে আবৃত হিংস্র বন্যপশু ও বিষাক্ত সাপের ছোবলের পাশাপাশি কালান্তক যমের মতন ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আড়তভূমিকে চা-বাগিচায় রূপান্তরিত করতে দধিচীদের সংগ্রহ করতে আড়কাঠিদের পাঠানো হয়েছিল বনবাসী অধ্যুষিত দেশের মধ্যভাগ অঞ্চলে, সেখানে তখনও খনিজ সম্পদের খোঁজ মেলেনি। দারিদ্র্য বনবাসীদের জীবনে সর্বত্র জড়িয়ে আছে। আড়কাঠিরা বনবাসীদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের নানা মিথ্যা প্রলোভনের ফাঁদে বন্দি করে চা-বাগিচা কেন্দ্রে হাজির করত। একবার বাগানের সীমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলে তাদের আর সেখান থেকে বের হবার কোনো উপায় থাকত না। এরা যাতে মালিকের অত্যাচার সইতে না পেরে বাগান থেকে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য চালু হয়েছিল Workman's Breach of Contract Act (1859)।

মালিকের অত্যাচার কেমন ছিল তা সনৎকুমার বসু তাঁর বই 'Capital and Labour in Indian Tea Industry (1859)' বইতে ক্যাপ্টেন ল্যাম্বের ডায়েরি থেকে জানিয়েছেন। ক্যাপ্টেন ল্যাম্বের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাতজন বনবাসী শ্রমিকের। এদের পিঠে ছিল গভীর ক্ষত। ল্যাম্ব এদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন এই সমস্ত শ্রমিকেরা বাগানে রেশন না পেয়ে বাগান ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছিল। বাগান থেকে বেরোবার সময় বাগানের পাহারাদারের হাতে ধরা পড়ে যায়। ওদের নিয়ে যাওয়া হয় বাগানের শাস্তির ঘরে। সেখানে তাদের হাত-পা বেঁধে প্রচণ্ড ভাবে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তারপর সেই ক্ষতস্থানে তেল ও নুন দিয়ে ডলা হয়েছিল।

আজ নানা শ্রমিক নেতার আত্মত্যাগ এবং তার জন্মদিন পালন করতে ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হয়। কোথাও কিন্তু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর নাম উচ্চারণ করা হয় না। অথচ যখন চা-বাগানের বাইরের কোনো মানুষের প্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না, ধরা পড়লে চা-কর মালিকের পাহারাদারের হাতে মৃত্যু, তখন বনেদি ঘরের উচ্চশিক্ষিত সন্তান দ্বারকানাথ ছদ্মবেশে মালিকের পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে চা-বাগিচা শ্রমিকের অবস্থাকে নিজে প্রত্যক্ষ করতে মাসের পর মাস শ্রমিক বস্তিতে কাটিয়েছেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি প্রকাশ করলেন 'Slave Labour is Modern India'। এই বইতে চা-শ্রমিকদের ওপর মালিকের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ পড়ে খোদ লন্ডনেও তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম ও তার বইটির কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তাঁর নাম রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং তাঁর লিখিত বইটির নাম 'কুলিকাহিনী'। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে অসম ও উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের ওপর বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সর্দার মারফত চা-বাগানের মালিকেরা তাদের বাগানের জন্য যে শ্রমিক সংগ্রহ করত

তার জন্য সর্দারেরা শ্রমিক পিছু কমিশন পেত ১ পয়সা। তবে এই সমস্ত সর্দাররা যাতে শ্রমিকদের একছত্র অধিকারী না হতে পারে তার জন্য এক একটি বাগানে থাকত একাধিক সর্দার। একজন সর্দারের অধীনে থাকত ৫০ জন শ্রমিক।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের মতনই নেপালের সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। নেপালের শাহরাজারা পূর্ব নেপাল দখল করার পর জমি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছিল তাতে পূর্ব নেপালবাসীরা জমির ওপর তাদের মালিকানা হারিয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব নেপালের অধিবাসীরা কিরাত বলে পরিচিত ছিল। শাহরাজাদের আমলে বিচারপদ্ধতি চলত দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে। সংস্কৃত ভাষা জানে এমন মানুষই হতেন বিচারপতি। কিরাতরা দেবনাগরী লিপি বা সংস্কৃত কোনোটাই জানত না। ফলে বিচার ব্যবস্থাতে সুবিচার পেত না।

দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা ছিল প্রায় জনশূন্য। সিকিম রাজা তার প্রজাদের সিকিমের বাইরে যাবার অনুমতি দিত না। তাদের আশঙ্কা ছিল সিকিমে তাহলে শ্রমিকের অভাব দেখা দেবে। এমন সময় চা-বাগিচার আড়কাঠিরা পূর্ব নেপালে উপস্থিত হয়ে 'চিয়া কা বোট মা সুন ফলছ' অর্থাৎ চা-গাছে পাতায় সোনা ফলে প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নেপালিদের সেখানে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো। এছাড়া পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে পরিচিত এবং কষ্টসহিষ্ণু ও অনুগত এই নেপালিদের ইংরেজ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করতে দার্জিলিং-এ সৈনিক নিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। পূর্ব নেপাল থেকে দলে দলে নেপালিদের এখানে আসার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল।

বাগিচা শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সূত্র ধরে গড়ে উঠল জনপদ। প্রয়োজন হলো চা-বাগিচা-সহ জনতাদের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কুলি শ্রমিকদের সঙ্গে নিযুক্ত করা হলো 'বাবু কেরানীদের, কুলিবস্তি থেকে পৃথক করে তৈরি করা হলো বাবু কোয়ার্টার্স। তার থেকে পৃথক স্থানে তৈরি হলো ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজারের বাংলো। সবাই একে অপরের থেকে আলাদা। বাবুদের দাবি মেনে স্থাপিত হলো স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। চা-এর বিশ্বজয়কে ধরে রাখতে গড়ে তুলতে হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা। তৈরি হলো সড়ক পথ।

পাথর কেটে আর জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা নির্মাণের কাজ ছিল অবর্ণনীয় শ্রমসাধ্য। স্থানীয় রাজবংশীরা শ্রমিক রূপে কাজ করতে না চাওয়ায় এখানে আনতে হলো নেপাল ও ভারতের মধ্য অঞ্চলের বনবাসী শ্রমিকদের। ১৮৬০ সালে শুরু হলো আধুনিক রাস্তা নির্মাণের কাজ। অবশ্য ১৮৩১ সালে জেনারেল নেপেয়ারের তত্ত্বাবধানে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে পাহাড়ের বুক চিরে নির্মিত হয়েছিল একটি রাস্তা। সেটি আজ পাঙ্খাবাড়ি রোড নামে পরিচিত।

দীর্ঘ ৯ বছর ধরে নেপালি ও মদেশিয়া (মধ্যদেশ থেকে আগত বনবাসী)-দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের হিলকার্ট রোড (বর্তমানে তেনজিং নোরগে রোড)। চা-বাগিচার প্রয়োজনেই নিতে হয়েছিল রেল লাইন স্থাপনের কর্মসূচি। ১৮৭৮ সালে কলকাতার উমমিনেল এবং রামসে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এই দুঃসাধ্যজনক কাজটির। সেই নেপালি ও মদেশিয়া শ্রমিকের অমানুষিক শ্রমে সম্পন্ন হলো আধুনিক পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য সর্বোচ্চ রেল লাইন (এখন সেই গৌরব হারিয়েছে) দার্জিলিং-হিমালয়ান রেল যা এখন 'টয় ট্রেন' বলে পরিচিত।

আজকে তাই এক কথায় বলা যায় দার্জিলিং-ডুয়ার্স চা-বাগিচার ডুয়ার্স। এই অঞ্চলের নিঃশ্বাস নেপালি-বাঙালি-বনবাসীদের সম্মিলিত নিঃশ্বাস। এই অঞ্চলের গড়ার পেছনে আছে প্রতিটি জনজাতির ঘাম, রক্ত ও কান্না। এখানে এরা একে অপরের পরিপূরক। কেউ দেশি বা কেউ বিদেশি নয়।

উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পের সঙ্কট অনেকটাই কৃত্রিম :

উত্তরবঙ্গ ও চা একে অপরের পরিচয়। চা-শিল্প বাঁচলে উত্তরবঙ্গ বাঁচবে। উত্তরবঙ্গের জীবন প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চা-শিল্পকেও বাঁচাতে হবে। উত্তরবঙ্গের ২০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে চা-শিল্পের ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল।

উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পে কি সত্যিই সঙ্কট দেখা দিয়েছে? প্রশ্নটা তোলার পেছনে অবশ্যই কারণ আছে। চা এমন একটা শিল্প যার বিশ্বব্যাপী অবস্থানের পাশাপাশি একটা জাতীয় চরিত্র আছে। এই শিল্পে যদি সত্যিই কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হয় তবে তো সেই সঙ্কটের মেঘ অসম এবং দক্ষিণ ভারতের চা শিল্পের আকাশেও ঘনীভূত হোত। তা কিন্তু হচ্ছে না। বিশ্ববাজারে তো চটশিল্পের মতন এর চাহিদা তলানিতে ঠেকেনি। বরং বিশ্বের বাজারে যেমন চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি দেশের বাজারে এর চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

পশ্চিমবাংলার ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের শাসনে একটা বেদনাদায়ক শ্রমচিত্র উপস্থিত হয়েছে। এখন শ্রমিকরা তাদের দাবি তোলার সাহসটাই হারিয়ে ফেলেছে। এখানে এখন মালিকরা তাদের কারখানা চালু রাখার শর্ত দিচ্ছে। শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের চাকুরি বজায় রাখতে সেই শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

সারা রাজ্যের মতো উত্তরবাংলার চা-বাগিচা বলয়ে শ্রমিক বিক্ষোভের কোনো খবর নেই। এখানে শ্রমিক সংগঠনগুলি তারকেশ্বর লোহারদের মতন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হাতে বন্দি। বঞ্চনার তীব্রতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। রেশন বন্ধ। চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বাসস্থানের মাথার ওপর ভেঙে যাওয়া আচ্ছাদনের মেরামতের ব্যবস্থা নেই। বেতন নেই। বোনাস নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা পড়ে না। অবসরকালে শ্রমিকের প্রাপ্য অর্থ মেলে না।

ট্রেড ইউনিয়ন আছে, প্রতিরোধের ভাষা নেই। মালিকেরা ইচ্ছেমতো চা-বাগান লকআউট ঘোষণা করে শ্রমিকের প্রাপ্য অর্থ তো বটেই বাগানের সম্পদ লুঠ করে চলে যাচ্ছে। মালিকানা কাগজ কলমে হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। নতুন মালিক আগের মালিকের

সময়কার কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না।

অসহায় শ্রমিকরা দেখছে ট্রেড ইউনিয়নের বাবুরা তাদের নিয়ে ট্রেড করছে। মালিক, কমরেড, নেতা প্রশাসনের এক ত্রিভুজ চা- বাগানগুলিকে লুটের খনি বানিয়ে চলেছে।

উত্তরবঙ্গের বহু চা-বাগিচাই এখন চা শিল্পের পরিবর্তে গদি ব্যবসাতে রূপান্তরিত হয়েছে। চা-বাগানের লোকসান দেখাবার কৌশল এই এলাকার একটা শিশুও ধরে ফেলতে পারলেও রাজ্য সরকার ধরতে পারে না, টি বোর্ড খবর রাখে না। রাজ্যের চা-শিল্পের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করতে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চা উন্নয়ন নিগম। এর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল চা উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় রাজধানীর নগর সভ্যতার ছাতার তলে। ফলে এই নিগম হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরকেন্দ্রিক আমলা পোষার প্রতিষ্ঠান। এদের সুযোগ্য পরিচালনায় তো এদের অধিগৃহীত চা-বাগানগুলিতে সোনা ফলার কথা ছিল, অথচ এই সংস্থাটির হাতে যে চা-বাগানগুলির পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল সেগুলি রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়েছে। এই সংস্থার আর্থিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি ও কলকাতার চা নিলাম কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের অধিগৃহীত পাঁচটি চা-বাগান থেকে যে আয় হয়েছে তা বাগানগুলির পরিচালন ব্যয়ের মাত্র ৬০ শতাংশ। ২০০১-২০১০ বর্ষে বাগানগুলির পরিচালন ব্যয় হয়েছিল ১৩.৫০ কোটি টাকা। ওই বর্ষে তাদের আয় হয়েছিল ৭.৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার অধিকাংশ চা-বাগিচাগুলি যখন লাভের মুখ দেখছে তখন রাজ্য চা উন্নয়ন নিগমের 'সুযোগ্য' পরিচালনায় তাদের পরিচালিত চা-বাগানগুলির লোকসানের পরিমাণ ৫.৯০ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকার যে চা উন্নয়নের জন্য কতখানি চিন্তিত তা বোঝা যায় এই চা উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমেই। এই দপ্তরের প্রধান রূপে নিয়োগ করা হয়েছে কোনো চা বিশেষজ্ঞকে নয়। এক অবসরপ্রাপ্ত আমলাকে। বেতন মাসিক ৬০ হাজার টাকা। তার দায়িত্ব কোম্পানির হিসেবে দিকটা দেখার।

চা-এর দাম ঠিক হয় চা নিলাম কেন্দ্রে। চা-এর দোকানে বিভিন্ন দামের চা থাকে। অথচ নানা কারখানা থেকে চিনি ইত্যাদির মতন ভোজ্য সামগ্রী উৎপাদিত হলে বাজারে কিন্তু একই দামে বিক্রি হয়। তবে চা-এর দামে এত পার্থক্য কেন?

চা-বাগানের উৎপন্ন সামগ্রীকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় Heterogenous বা বহুবিধ। একই বাগানে বিভিন্ন মানের চা উৎপন্ন হতে পারে। তাই এর মান অনুসারে দাম ঠিক করার জন্য চা নিলাম কেন্দ্রে থাকে 'টি টেস্টার।

নিলাম কেন্দ্রকে এড়িয়ে চা-বাগানের মালিকেরা সরকারের চোখের সামনেই সরাসরি এক্সফ্যাক্টরি দামে চা বিক্রি করে দিচ্ছে। এর ফলে যে দামে চা বিক্রি হচ্ছে কাগজ কলমে তার থেকে অনেক কম দেখানোর সুযোগ থাকে। এতে সরকার হারাচ্ছে তার রাজস্ব। শেয়ার হোল্ডাররা পাচ্ছে না লভ্যাংশ। বাজারে চা-এর দাম পাওয়া যাচ্ছে না বলে চা-মালিকেরা বাগানটিকে রুগ্ন দেখিয়ে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ নিচ্ছে।

নিলাম কেন্দ্রেও আছে সিন্ডিকেট। সেখানে কাগজ কলমে অনেক টি ব্রোকার থাকলেও ৭-৮টি ব্রোকারই চা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা মালিকের সঙ্গে আগেই বন্দোবস্ত করে নেয়, নিলামে ওঠাবে কম দাম বাকিটা নগদে দিয়ে দেয়। এতে মালিকের পকেট ভারী হয় কালোটাকায়। ব্রোকার কোম্পানি ফাঁকি দিতে পারে এক্সাইজ ডিউটি। নিলাম কেন্দ্রে যে চা-এর দাম ৫০ টাকা সেটাই বাজারে ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এই ১৫০ টাকা কাদের পকেটে কীভাবে যাচ্ছে?

সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকরা এই চুরি ধরে দিয়েছিল :

জলপাইগুড়ি শহরের বীরেন ঘোষ চা-বাগানের মালিক রূপে এক সময় অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬০ সালে ডানকান ব্রাদার্সের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ১১৭৩ একরের শাঁওগা চা বাগানটি কিনে তাঁর মেয়ের নামে নামকরণ করেন সোনালি। এর ১৭ বছর পরে তিনি যখন বাগানটি বিজয়কুমার খেমকা ও তাঁর ভাই কৃষ্ণকুমার খেমকার কাছে বিক্রি করেন তখন পি এফ, জমির খাজনা, ব্যাঙ্ক, টি বোর্ড ইত্যাদির কাছে দেনার পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ টাকা। শ্রী ঘোষ এর কোনো দায়িত্ব পালন করেননি। শুধু লাভই নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন, খেমকারা এই ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বাগানটি কিনতে গেলেন কেন? এই রহস্যটা জানা গেলে বোঝা যাবে বাগান নিয়ে লুঠের বিষয়টা।

খেমকাদের কিন্তু এই বাগানটি কিনতে এক পয়সাও দিতে হয়নি। কেনাবেচা হয়েছিল শুধু কাগজ কলমে। আর এভাবেই এখানে মালিকানার পরিবর্তন ঘটে চলে। এবং মালিক বাগানকে লুঠ করে অপর মালিককে লুঠ করতে দিয়ে তার দায়িত্ব এড়াতে সরে পড়ে। সরকার জানে, টি বোর্ড জানে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানে, ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা জানে।

ধীরেনবাবুরা এক পয়সা না নিয়েই বাগানটিকে খেমকাদের দিয়েছিলেন কেন? ধীরেনবাবুরা বাগানটা কিনেছিলেন ২ লক্ষ টাকা দিয়ে। প্রতি বছর তারা সব খরচ বাদ দিয়ে গড়ে ২ লক্ষ টাকা লাভ করে থাকেন, তবে এই ১৭ বছরে তারা লাভ করেছেন ৩৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া এই বাগানের ওপর দিয়ে রেল লাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থও পেয়েছিলেন।

এবার পালা খেমকাদের। তারা এক বছরের মধ্যেই বাগানের ট্রাক্টর, ট্রাক, নিউটন সাহেবদের প্রকাণ্ড বাংলো বিক্রি করে দিল। ধীরেনবাবুদের রেখে যাওয়া হাজার মণ চা ব্যাঙ্কের সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ককে না জানিয়ে বিক্রি করে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে নতুন করে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে কাউকে না জানিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন। তারা কোম্পানির প্যাডে ও টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে দিলেন ৩৪ লক্ষ টাকা দেনা-সহ বাগানের মালিকানা তাঁরা শ্রমিকের হাতে তুলে দিলেন।

সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকেরা এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিল। তারা গড়ে তুলল 'সাওগা টি অ্যান্ড অ্যালায়েড প্ল্যানটেশন ওয়ার্কস কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'।

একটা পরিত্যক্ত চা-বাগানের সহায়সম্বলহীন শ্রমিকরা সমবায় প্রথায় চা-বাগানের দায়িত্ব নিয়ে তাকে নিয়ে শুধু যে নতুন জীবন দেওয়াই নয় দু' বছরের মধ্যে শুধু সবুজ পাতা উৎপন্ন করে তাকে লাভজনক সংস্থায় রূপান্তরিত করে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করার প্রস্তাব নিয়ে ব্যাঙ্কের দপ্তরে উপস্থিত হতে পারে সেটা মালিক তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও শাসক রাজনৈতিক দলের কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল। তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকদের এই সমবায়ের সাফল্য যদি চা-বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাদের এতদিনকার মালিক ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক নেতার ত্রিভুজাকৃতির সাম্রাজ্য ভেঙে যাবে। তাই সেদিন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ সেই পালিয়ে যাওয়া খেমকাদের হাতে বাগানটিকে তুলে দিতে শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে এই সমবায় আন্দোলনকে ভেঙে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আজকের উত্তরবাংলার বন্ধ চা-বাগিচার অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের সামনে সোনালি চা বাগানের সেই লড়াই একটা আদর্শ হতে পারে। তার জন্য সেই সমবায় আন্দোলন নিয়ে পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

চা-বাগানে মৃত্যু মিছিল :

বন্ধ হয়ে থাকা রামঝোড়া চা-বাগানের ১৫ বছরের কিশোরী মানসী ভুভুর অপুষ্ট দেহকে দেখলে মনে হয় তার বয়স ৮ বছরও পার হয়নি। আবার অনাহারের ছাপ কপালের ভাঁজ করা চামড়া থেকে তাকে ৯০ বছরের বৃদ্ধা বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রামঝোড়া চা-বাগান বন্ধ। তার বাবা ও মা দুজনেই মারা গেছে অনাহারে। সরকারি ভাবে অবশ্য একে অনাহারে মৃত্যু বলে মানা হয়নি। বলা হয়েছে মারা গেছে অপুষ্টিজনিত রোগে। রামঝোড়া চা-বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী সমীর বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই বাগানের ৮৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে অনাহারে।

কালচিনি ব্লকের রাইসাটাও চা-বাগান একই ভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল মালিকেরা। ২০০২ এর অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যেই ৪ জন শিশু-সহ ১০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হলো অনাহারে। সরকারি ভাবে জানানো হলো এদের মৃত্যু হয়েছে আন্ত্রিক রোগে। বাগান বন্ধ হবার পর এখানকার শ্রমিকেরা বুনো লঙ্কা ও পতঙ্গ যা মানুষের অভক্ষ্য বলে বিবেচিত তা খেয়ে চলেছে। আন্ত্রিক যদি হয়েই থাকে তবে তার কারণও তো এই বন্ধ চা-বাগান। উদাহরণের পর উদাহরণ দেওয়া যায়। এই পরিসরে তা সম্ভব নয়।

চা-বাগিচার মৃত্যু প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের হলফনামায় যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে চিফ মেডিক্যাল অফিসার প্রদত্ত রিপোর্টের মিল নেই। চিফ মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্টে বলা হয়েছে পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলিতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ঘটেছিল ৫ জনের। ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল আমাশয়ে। অন্য অসুখে মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯ জনের।

সেই অবস্থা কিন্তু এখনও চলছে। বাগানের শ্রমিকরা চা-বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ শেখেনি। এরা ভিক্ষা করতে জানে না। চুরি-ডাকাতি করতে পারে না। এদের দুটো কেজো হাত আছে কিন্তু কাজ নেই। এদের ক্ষিধে আছে, খাবার নেই। এখানে আছে ৩২টি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। শ্রমিকদের বাঁচার দাবিতে কোনো শ্রমিক আন্দোলন নেই।

বাগানের এই অবস্থা নিয়ে আলোচনার দরকার আছে, একই সঙ্গে বাগানের মুমূর্ষু অবস্থার উৎস নিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে। চা-গাছ ফল দেয় ৫০-৬০ বছর, অধিকাংশ চা-গাছের বয়স প্রায় ১০০ বছর। মালিকেরা পুরনো গাছের পরিবর্তে নতুন চারা লাগাতে উৎসাহী নয়। ভরতুকিতে সার এনে বাগানে ব্যবহার না করে বাজারে বেশি দামে বিক্রি হয়ে যায়। বহু মালিক নানা বেনামিতে কোম্পানি খুলে তার মারফত নানা সামগ্রী কেনার মিথ্যে হিসেব দেখিয়ে অর্থ আত্মসাত করে চলেছে।

বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা এখনো তাদের শরীরের সঙ্গে মিশে যাওয়া শূন্যপাকস্থলীতে দু'দানা ভাত পেতে, ভাতের গন্ধের স্বপ্ন দেখতে 'রামনাম সৎ হ্যায়' ধ্বনির সঙ্গে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলতে পা মিলিয়ে চলেছে। চা-বাগিচার সাম্রাজ্য কিন্তু চলছে যেমন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রাজদরবারে ঘুঙ্গুরের আওয়াজ আর রঙীন পানীয়র মৌতাত চলেছিল।

বাবুরা আসেন বাগানে। দিতে হয় মাসোহারা। আসেন মন্ত্রীবাবু, মালিকবাবু, ইউনিয়নবাবু, টি বোর্ড বাবু। আসেন চা-বাগিচার জমিতে গড়ে ওঠা রিসর্টে বায়ু পরিবর্তনের জন্য শহরের বাবুরা। তাদের গাড়ির চাকার ধুলোয় 'দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি' ঢেকে যায়। এদের আওয়াজে চাপা পড়ে যায় কর্মহীন ও অনাহারে মৃত্যুর দুয়ারে এসে পড়া হতভাগ্য শ্রমিকদের গোঙানি স্বর। অথচ এরাই সৃষ্টি করেছিল এই সাম্রাজ্য।

বাঁচতে হবে উত্তরবঙ্গকে। বাঁচাতে হবে তাই চা-শিল্পকে। খুঁজে বের করতে হবে চা-লুঠেরাদের। দেখতে হবে কারা এবং কেন চাঁদমণি চা-বাগানকে উৎখাত করে ১২০ কোটি টাকার জমি মাত্র ১৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৮৭ টাকার বিনিময়ে প্রমোটারের হাতে তুলে দিল। কোথায় গেল চাঁদমণি চা-বাগানের সেই বনবাসী শ্রমিকরা? তাদেরও বাঁচার অধিকার ছিল। কেন তাদের বাঁচানো গেল না?

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে যারা মৃত্যুর বীজ বপন করে চলেছে তারা কিন্তু চা-শিল্পপতি হতে পারে না। এরা লুঠ করে চলেছে চা-শিল্পকে। এরা হত্যা করতে চাইছে উত্তরবঙ্গের প্রাণস্পন্দনকে। ধুঁকছে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি, মরছে চা-শ্রমিক। ধ্বংসের খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে সবার ভবিষ্যৎ। এই শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।

(লেখক উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

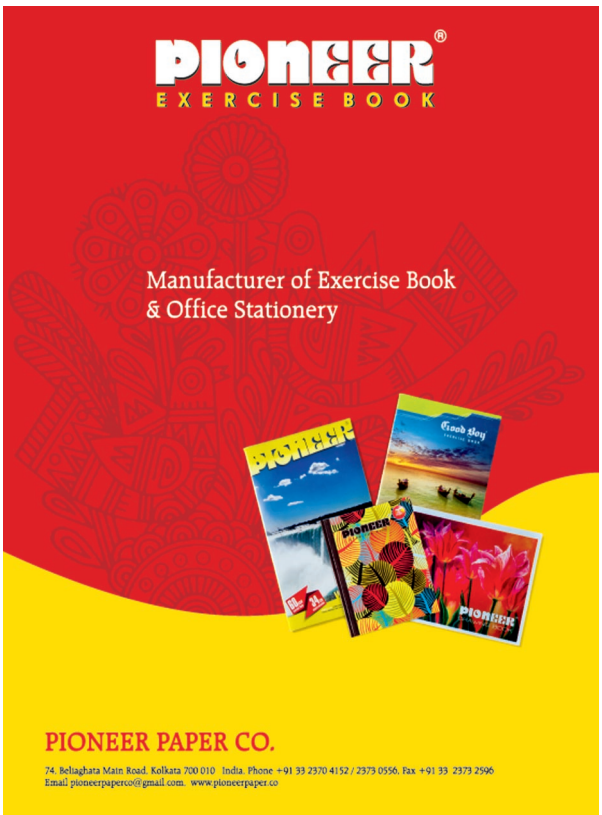

নেত্রদান মহাদান

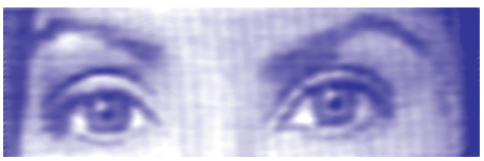

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

উত্তরবঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতির স্তম্ভ ইকোফ্রেন্ডলি চা-বাগিচা

রাম অবতার শর্মা

বাগিচা সেক্টর সারা ভারতের অর্থনীতি, জাতীয় আয়, বিদেশি মুদ্রা অর্জন-সহ সামাজিকভাবে ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে মূলত পাহাড়ের কোলে কিংবা পাহাড়ের পাদদেশে ST, SC, OBC ইত্যাদি ভারতীয়দের অন্যতম কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র।

ভারতে ১৫.১ লক্ষ গ্রোয়ার এবং ২২.৯ লক্ষ শ্রমিক বাগিচা সেক্টর অর্থাৎ চা, কফি, রবার, মশলা চাষে কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়-সহ তরাই, ডুয়ার্সের ৩০৭টি বৃহৎ চা-বাগিচায় প্রায় আড়াই লক্ষ স্থায়ী শ্রমিক, কর্মচারী এবং বিপুল সংখ্যক অস্থায়ী চা-শ্রমিক কাজ করছেন। এইসব শ্রমিকদের চা-বাগিচা স্থাপনকালে বৃটিশরা মূলত রাঁচী, দুমকা, সাঁওতাল পরগনার উঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহালী-সহ নেপালের নেপালি ভাষাভাষী বাউন, ছেত্রী-সহ অন্যান্য নেপালি ভাষাভাষী ST, SC, OBC -দের এনে চা-বাগিচার কাজে নিযুক্ত করে। সময়ের সঙ্গে এরা সবাই আজ উত্তরবঙ্গবাসী। ডুয়ার্সের আদি ট্রাইবাল যথা মেচ, টোটো, রাভা, সাংমা, চিম্বা, রাজবংশী ইত্যাদিরাও এখনো উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মূলত ১৯৯১-এর পরিবর্তিত শিল্পনীতি ও উদারমুক্ত বাজার অর্থনীতির সূচনাকাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বিশেষত কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি, মাল, রাজগঞ্জ, সদর ব্লকের প্রায় প্রতিটি গ্রাম, গোটা শিলিগুড়ি ও কার্শিয়াং মহকুমা, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, চোপড়া-র চারিদিকে চা-গাছ আর চা-গাছ।

উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এইসব ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সঠিক সংখ্যা কত তা টি-বোর্ডের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা সম্ভব নয়, কারণ টি-বোর্ডের রেজিস্টার্ড চা-বাগিচা হতে হলে চাই রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ছাড়পত্র (এনওসি)। তা আইনি নানা জটিলতায় পশ্চিমবঙ্গে এখনও পাওয়ার অপেক্ষায় (ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমিতিগুলির তথ্যানুযায়ী) ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা-চাষি দিন গুনছেন। তবে সমিতিগুলির মতে, উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে লক্ষাধিক চা-বাগিচা গত তিন দশকে হয়েছে। এতে গ্রামাঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার সংস্থান হচ্ছে। এসেছে উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পারিবারিক, সামাজিক ও সর্বোপরি আর্থিক পরিবর্তন; এসেছে জীবন যাত্রায় নানা পরিবর্তন।

'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'— চা-পাতা সংগ্রহ।

সারা ভারতে টি-বোর্ড পঞ্জীকৃত ১৫৭৫০৪ টি ক্ষুদ্র চা-বাগিচার (১০.১২ হেঃ পর্যন্ত) মধ্যে অসমে ছিল ৬৪৫৯৭টি আর উত্তরবঙ্গে মাত্র ৯৯৯০ টি (সূত্র টি বোর্ড as on 31.12.2009)। আই টি এ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে উত্তরবঙ্গে চা-বাগান সম্প্রসারিত হয়েছে নতুন ১১৯৮০ হেক্টর জমিতে, তার মধ্যে কেবলমাত্র ডুয়ার্সের বৃহৎ চা-বাগানের বিস্তার মাত্র ৩৯১৮ হেক্টর। চা-আবাদি জমি জেরেই ধরে নেওয়া যায় বাদবাকি ৮০৬২ হেক্টর কিংবা ৬৭.৩০ শতাংশ সম্প্রসারণ গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র চা-বাগিচা ক্ষেত্রে।

সুতরাং অবিতর্কিত ভাবে বলাই যায়, ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ের ১৯৫০ সালে সারা ভারতে ৬৭৩১ টি চা-বাগানে মোট ৩,১৫,৬৫৬ হেক্টর চা-আবাদি জমি ছিল। ২০০৯ সালে ১,৫৯,১৯০ টির টি-বোর্ড রেজিস্টার্ড চা-বাগানের ৫,৭৮,৪৫৮ হেক্টর চা-আবাদি জমিতে বৃদ্ধির শ্রেয় তো মূলত ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সম্প্রসারণের ফলেই। অসমে ৮২৫টি বৃহৎ চ-বাগিচা আছে আর উত্তরবঙ্গে ৩০৭টি (দার্জিলিং ৮৫, ডুয়ার্স ১৫৫ এবং তরাই-দিনাজপুরে ৬৭টি)। ভারতের বাগিচা পণ্য থেকে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক আয় হয় এবং বিদেশে

রপ্তানি করে আয় হয় প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা। এর সিংহভাগ চা-বাগিচার অবদান। সুতরাং চা-বাগিচার গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান সময়ে চা-শিল্পের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ মুক্তবাণিজ্য ও উদার অর্থনীতির যুগে আর্থিক বিকাশ ইনস্টিটিউট মুখী করার প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বেশি। বাগিচা বিশেষ করে চা-বাগিচার অবস্থান এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। চা-বাগিচার অবস্থান বুঝাতে শরণাপন্ন হচ্ছি শ্রমিক সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন (১৯৬৯)-এর সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পি বি গজেন্দ্র গাটকর সাহেবের একটি বর্ণনায়— "The cultivation and manufacture of Tea do not exhaust the activitis associated with tea plantation. A typical plantation covers a wide area having a large resident population is a number of sattlements. On crapement of plantations involves construction and maintanance of roads and pritdings running of Hospitals, Schools, Creches and centres etc. and in a miniature form transport and Public Health activities. In short a plantation is a self contained chif of an organisation." ---প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গাটকর সাহেব এসব কথা ১৯৬৯ সালে বললেও বাগিচা শিল্পের গুরুত্ব তো সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সরকার অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাগিচা শিল্পকে সংবিধানের সপ্তম সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। সরকারি ঘোষিত সিদ্ধান্তে বলা হলো, ...Industries the control of which by Union by can mode by Parliament is declared to be in public interest."

পাশ হলো ভারতীয় সংসদে Tea Act 1953। উক্ত আইনের 'ধারা-দুই'-এ বলা হলো, "It is hereby declared that it is repedient in public interest that the Union should take under its control the tea coffee industry." তারও পরে Rubber Act, Coffee Act, Cardamom Act, Union spices Act ইত্যাদিও সংসদে পাশ হলো। এভাবে বাগিচা শিল্প কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা guided, assisted and controlled হয়ে অগ্রগতির নতুন নতুন মাইলস্টোন ছুঁতে লাগলো।

লৌহপুরুষ বল্লভভাই প্যাটেল একবার ধর্মঘটরত আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "No country prosper without industry. Nor can labour in modern sense survirve without industry." অত্যন্ত মূল্যবান কথা। চা-বাগিচা, চা-শ্রমিক, চা-বাণিজ্যের উপর প্রকল্প কিংবা পরোক্ষভাবে জীবন জীবিকার জন্য জড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষ চায় চা-শিল্প বাঁচুক এবং তাদের প্রত্যেকের জীবনজীবিকা সুরক্ষিত হোক। লৌহপুরুষের আরো দুটি কথা আমার অনেক মূল্যবান মনে হয়েছে তাই উল্লেখ করছি। বল্লভভাই বলেছিলেন, "Labour is a driving force for the stabilisation of our freedom and no Govt. can effort to ignore what should be done to them."

তাই শ্রমিক কল্যাণের জন্য ভারতের সংসদে পাশ হলো Plantation labour Act, 1951. এটি একটি কেন্দ্রীয় আইন, তার লাভজনক সুযোগ-সুবিধা প্রতিটি বাগিচা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে আইনি ব্যবস্থা। এ বাদেও চা-বাগিচায় লাগু হলো বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণকারী আইন। চা-শ্রমিকদের চাকুরি সংক্রান্ত আইনটি হচ্ছে The Industrial Supplyment (standing orders) Act, 1946।

P.L. Act 1952 সারা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় PL Rules কিন্তু তৈরি করে রাজ্য আইনসভা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে PL Rules 1956 চা-বাগিচা-সহ সিঙ্কোনা বাগিচায় চালু আছে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচায়ও The Environment (Protection) Act, 1986 The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 কিংবা The Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981 চালু হয়েছে। আমি অবশ্য আজও বুঝতে পারিনি, ইকোফ্রেন্ডলি চা-বাগিচার ক্ষেত্র Environment Protection Act এর সত্যি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

চা-গাছ, চা-বাগিচা তো সত্যি সত্যি বাস্তুসংস্থান পরিবেশের জন্য সবার অলক্ষ্যে নীরবে উপকারী ভূমিকা পরিবেশ বন্ধু হিসাবে পালন করে যাচ্ছে। একটি তথ্য তুলে ধরছি। ২০০২ সালে The School of Environment. Resources and Dev. of Asian Institute of Technology চা-বাগিচার পরিবেশ অবদান বা ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়ে বলেছিল ভারতের ৫.৬৭ মিলিয়ন হেক্টরে বিস্তৃত সদা সবুজ চা-বাগিচার ইকোসিস্টেম সারা বৎসরে প্রতি হেক্টর চা-বাগিচা ২৯.৫৫ টন কার্বন-ডাই অক্সাইড শোধন করে। সুতরাং ভারতের চা-বাগিচা বৎসরে ১৫.৩৬ মিলিয়ন টন CO_2 বায়ুমণ্ডল থেকে শোধন করে চলেছে। সারা ভারতের চা-বাগিচা সারা বৎসর মোট CO_2 জেনারেট করে মাত্র ১.৯৪ মিলিয়ন টন। এভাবে দেখলে, উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গত কয়েক দশক যে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপিত হয়েছে তাতে সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের এবং রূপকার্থে পশ্চিমবঙ্গ- সহ সংলগ্ন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেরও আবহাওয়া দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করবে। তবে এটা ঠিক, চা-বাগিচায় এখন উচ্চফলনশীল ক্লোনাল চা-গাছ লাগানো হয়। এই সব চা-গাছের উৎপাদনশীলতা যেমন অনেক বেশি, পাশাপাশি সার থেকে জল ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও অসুখবিসুখের হাত থেকে চা গাছের রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক অজৈব এগ্রোক্যামিকেলের প্রয়োগও বেশি মাত্রায় করতে হয়। এর উপর বিজ্ঞানের কুপ্রভাবে উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের আবহাওয়ায় পরিবর্তন হয়েছে। তাই এখন বারো মাসের মধ্যে প্রায় ৪/৫ মাস ধরে জলসেচ করতে হয়। উত্তরবঙ্গের একাধিক নদী, ঝোড়ায় এখন আগের মতো জল উপলব্ধ নয়। জলসেচের জন্য চা-বাগিচাসহ অন্য কৃষি কাজের প্রয়োজনে ভূগর্ভের জলের ব্যবহার বেড়েছে। পানীয় জল হিসাবেও ভূগর্ভের জলের চাহিদা বেড়েছে। জনসংখ্যা তো লাগামহীন ভাবে গোটা উত্তরবঙ্গেও বেড়েছে। অবশ্য চা-বাগিচায় কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার একাধিক ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার

চা-শ্রমিকেরা করে থাকেন। তাই চা-বাগিচার মালিকদের সমিতিগুলির বার্ষিক সমীক্ষায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত তা বোঝা যায় চা-বাগিচার জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য থেকে। চা কিন্তু এখন পুরোপুরিভাবে এফ এস এস এ আই-এর অধীনে এবং Food safety and standard Regulation Act, 2011এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইন ভাঙলে আর্থিক জরিমানা-সহ জেলের শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। বর্তমানে টি-বোর্ড চা-বাগিচা অঞ্চলে এইসব আইন মানা হচ্ছে কিনা তা দেখতে বিশেষ অফিসারদের নিয়োগ করেছে। টি-বোর্ডের ওইসব অধিকর্তারা চায়ের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা শুরু করেছেন চায়ে এম আর এল-এর সরকার নির্ধারিত মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিনা। মোদ্দা কথা— চা লোকে পান করবে উপকারী পানীয় হিসাবে। সুতরাং ভারতের গত বৎসরের প্রায় ১২০০ কেজি মোট উৎপাদনের মাত্র ২০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়েছে বাকি তো দেশের বাজারেই চা-ভোক্তারা নিজেদের জন্য কিনেছেন। সবাই স্বাস্থ্য সচেতন। কাজেই কেবলমাত্র চায়ের চাহিদা আছে, কাজেই চা উৎপাদন বাড়িয়ে চলো, তা আর বলার নেই— চাই গুণগত ভাবে উন্নত মানের চা। এভাবে দেখলে বলা যেতেই পারে, অদূর ভবিষ্যতে চা-বাগিচায় অজৈব সার কিংবা অধিক রাসায়নিক কীটনাশকের প্রয়োগ কমতে বাধ্য।

দক্ষিণ ভারতের উপসাগরীয় চা-গবেষণা কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি একটি চায়ের ক্লোন বাজারে ছাড়া হয়েছে, নাম টি কে-৫। প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ৯০ কুইন্টাল— ভাবাই যায় না। এইসব ক্লোনের চা-বাগিচায় জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারও বাড়বে। কারণ কম জমিতে বেশি উৎপাদন বাড়িয়ে উৎপাদন খরচ কমানো যাবে, বাগিচার মোট খরচ কমবে— লাভ বেশি হবে। এটা যেমন বাণিজ্যিকভাবে চা-বাগিচার স্বার্থে কাম্য তেমন কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এইসব চা-ক্লোনের জন্য জমির দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্যের উপর কি প্রভাব পড়বে তাও আগে ভাগে ভাবা দরকার।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার সমস্যা দক্ষিণ ভারতের চা-বাগিচা থেকে একটু ভিন্ন। উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার শ্রমিকরা বাগিচা কোনো কারণে অচল, বন্ধ হলে বিকল্প জীবিকার কোনো পথ খুঁজে পায় না। দক্ষিণ ভারতে চা-বাগিচার শ্রমিক পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের যুবক- যুবতীরা শহরাঞ্চলে কলকারখানায় কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষত নির্মাণকর্মী হিসাবে কাজ পেয়ে যায়। মজুরি ও ছেলেমেয়েদের ভাল শিক্ষার সুযোগও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে 'চা অর্থনীতি'-র সত্যি বিকাশ এখনও নেই। উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করে সমস্যার কথা ও সম্ভাব্য সমাধানের কথা ভাবা যেতে পারে।

চা তৈরির একটা পট।

প্রথমেই আসছে, সংগঠিত ক্ষেত্রের বৃহৎ চা-বাগিচা ও তাতে কর্মরত স্থায়ী অস্থায়ী প্রায় ছয় লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী। দ্বিতীয়ত, গ্রামবাংলার ক্ষুদ্র চা-বাগান বি এল এফ গুলি। তৃতীয়ত, চা-শিল্পের উপর নির্ভরশীল অসংখ্য সরবরাহকারী সংস্থা ও তার কর্মী, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি চা-নিলাম কেন্দ্র, চা-গুদাম, চা বহনের রিকশাভ্যান-সহ ছোটবড় পরিবহন সংস্থা এরাই চা-বাগানের কারখানা থেকে নিলামকেন্দ্রে চা বহন করে আনে এবং নিলামে বিক্রির পর সারা ভারতে কোণে কোণে পৌঁছে দেয়। যে-কোনো শিল্প, বাণিজ্য সংস্থা লাভজনক না থাকলে তা চলতে পারে না। চা-বাগিচাও লাভজনক, তাই সেই বৃটিশদের স্থাপনাকাল থেকে আজও চলছে। স্বাধীনতা উত্তর যুগে চা-বাগিচার সম্প্রসারণ হয়েছে।

চা-অর্থনীতিতে একটি প্রতিপাদ্য আছে 'BEP'—(Break Even Point)— আরো বিস্তারিতভাবে বললে, BEP is the level of production and sales where total Revenue of sales is equal or above total costs (Variables and fined.)। প্রতিটি চা বাগান কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবে আজীবন চেষ্টা করে চায়ের গুণগতমান বৃদ্ধি করে চায়ের গড় বিক্রি মূল্য বৃদ্ধি করার। উদ্দেশ্য একটাই, চায়ের বিক্রয়মূল্য যেন উৎপাদন মূল্য থেকে অধিক পাওয়া যায় তবেই বাগিচার আর্থিক লাভ হবে। বি ই পি-এর সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে BEY অর্থাৎ Break Even Yeild আর BEY সরাসরি নির্ভরশীল YPH (Yeild per Hect.)-এর উপর। এটা গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে, প্রতিটি বাগানের ইল্ড কিন্তু সমপ্রকার হতে পারে না। তা চা-বাগানের স্থাপনাকাল থেকেই সত্য। যদিও এটা ঠিক প্রতিটি চা-বাগান প্রতি হেক্টরে চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করি। BEY নিয়ে আরো বিস্তারিত বলতে গিয়ে উল্লেখ করছি। BEY=(TFC/USP--UVC)/ TFC.

এক্ষেত্রে TFC মানে Total fixed cost। USP অর্থাৎ Unit Selling Price in Rupees per kg. আর UVC=Unit Variable cost.

চা পরিচালকেরা বলে থাকেন, cost of production of per kg. Tea made সরাসরি নির্ভর করে YPH (Yeild per Hect.) এর উপর। তাই দেখা যায়, চায়ের বাজারে তেজিভাব থাকলেও অনেক বাগান লাভ করতে পারছে না। গত একদশক তো বিশেষ করে ডুয়ার্সে দেখা গেছে, একাধিক চা-বাগান অচল, বন্ধ, পরিত্যক্ত; আবার অধিকাংশ চা বাগান চলছে— শ্রমিকরা কর্মরত। সমস্যা আগেও ছিল, আজও আছে।

স্বাধীনতার পর চা-বাগানে ন্যূনতম মজুরি আইন মতো শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি চালু করতে গিয়ে দেখা গেল, চা-বাগান তা দিতে অক্ষম। ওই সব চা-বাগানের মালিকপক্ষ স্পষ্ট বললো, ওদের চা-বাগানে চা-শিল্পের অন্য বাগানের সমহারে মজুরি চালু করলে বাগানগুলি বন্ধ করা ছাড়া আর বিকল্প পথ খোলা থাকবে না। তথ্য, প্রমাণে তা অবশেষে আদালতও তা মেনে নেয়। অবশেষে লেবার এপিলেট ট্রাইবুনাল ৫.৩.১৯৫৬ সালে তাদের রায়ে ডুয়ার্সের ১৩টি চা-বাগানকে 'Uneconomic' বলে স্বীকার করে তাদের জন্য পৃথক Pay Scale, D.A. ইত্যাদির Award মঞ্জুর করে। ১৯৫৬ সালের ওই ১৩টি চা বাগানের অধিকাংশ আজও মালিকানা একাধিকবার হস্তান্তরের পরও অলাভজনক। ওই ১৩টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো অনেকগুলি চা-বাগান। উত্তরবঙ্গের সংগঠিত ক্ষেত্রের ডুয়ার্স, তরাই, দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিকদের ১৯৭৬ সাল থেকে পুরুষ মহিলাদের সমহারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে। আবার ১.৬.১৯৯১ থেকে দার্জিলিং পাহাড় ও তরাই সমতলের সব চা-বাগানে সমহারে মজুরি দেওয়া চালু হলো। পরবর্তীতে ১০.৫.১৯৯৩ থেকে ডুয়ার্স ও তরাই দার্জিলিং পাহাড়ের ২৮৪টি বৃহৎ চা-বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের সমহারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের চা-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল পুরুষদের ১৭ আনা ৬ পয়সা, মহিলাদের ১৫ আনা ৬ পয়সা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের নয় আনা। এখন শিশু শ্রমিক নিয়োগ বেআইনি। চা বাগিচায়ও The Child labour (Prohibitation and Regulation Act) 1986 লাগু হয়েছে। বর্তমানে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৯৫ টাকা। শিঘ্রই তা বাড়বে। চা-শিল্পে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের মধ্যস্থতায় আলাপ আলোচনা করেই শ্রমিক কর্মচারীদের (বাবু স্টাফ) মজুরি। নির্ধারিত হয়। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চা-শ্রমিকের মজুরি ৯৫ টাকা কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তো তামিলনাড়ু কিংবা কেরল রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ ও অসম চা-শ্রমিকদের থেকে ওরা দ্বিগুণ মজুরি পেলেও বর্তমান প্রজন্ম চা-বাগিচায় কাজ করতে চাইছে না। বাধ্য হয়ে দক্ষিণ ভারতের চা-বাগানে যন্ত্রের সাহায্যে সবুজ চা-পাতা তোলা থেকে কলম কাটা, চা-চারা লাগানো ইত্যাদি শ্রমনিবিড় কাজগুলি করানো চালু হয়েছে।

চা-বাগানে যদি চা শ্রমিক না থাকে তাহলে কি সত্যি চা বাগানের অস্তিত্বের গুরুত্ব ও সামাজিক উপকারিতা থাকবে? উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষত স্বাধীনতা উত্তর যুগে শিল্প, স্বাস্থ্য, পোশাক, সেনিটেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। জীবন যাপনের ব্যাপারে এসেছে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। চা-শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাংলা, নেপালি, হিন্দী এমনকী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষা শেষে প্রাথমিক শিক্ষকতা থেকে সরকারি আমলা, মেয়েরা উড়োজাহাজের এয়ার হস্টেজ ইত্যাদি পেশায় কর্মরত। সুতরাং উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকও আজ নগরায়নের প্রভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতার আত্মসম্মান নিয়ে বাগিচা কর্মীরূপে বাঁচতে চায়। পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শ্রমিকপরিবারের ছেলেমেয়েরা সুদূর কেরল, কন্যাকুমারী থেকে মুম্বাই, গুজরাট, দিল্লী, এমনকী জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা সত্যি খারাপ কিন্তু টাটা, গুডরিক ইত্যাদি সব বহুজাতিক কোং-এর বাগান থেকেও অনেকে বাইরে যাচ্ছেন একটু ভালভাবে থাকতে, আরো আয় বাড়িয়ে জীবনযাপনের মানের উন্নয়নের জন্য। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাও তাদের আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার চেতনা এনে দিয়েছে। আমার মনে হয়, চা বাগিচা শ্রমিকদের জন্য সম্মানজনক পে-স্কেল করে তাদের চা কুলি/শ্রমিকের স্থলে মাস মাহিনার বাগিচা/কারখানা কর্মচারীর সম্মান দেওয়া দরকার। চা-বাগিচা দক্ষ শ্রমিক ছাড়া চলবে না। উত্তরবঙ্গের বৃহৎ চা-বাগিচা, শতাব্দী প্রধান চা বাগিচার উঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালী প্রমুখ কর্মীরাই। সিন্ধু, বিশ্বকর্মা, কালী, থামি, ভুজেল প্রমুখ বংশপরম্পরায় চা-বাগানে আছে এবং থাকবে। বরঞ্চ বলবো তারা যেন থাকে তা সুনিশ্চিত করা দরকার বাগিচার স্বার্থেই। সময় এসেছে উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচায় ৪/৫ তালা পাকা ৪৫০-৫৫০ স্কোয়ার ফিট মাপের পাকা বাড়ি তৈরি করে তাতে জল বিদ্যুৎ-সহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করে এগুলির মালিকানা শ্রমিক পরিবারের নামে করে দেওয়া। আর PL Act/Rules সংশোধন করে চা শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টারের স্থলে বার্ষিক একটি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা। Pl Act-এর চিকিৎসা-সহ অন্যান্য সামাজিক কল্যাণকারী ব্যবস্থাও চা শ্রমিক কর্মচারীদের ESI কিম্বা এ জাতীয় সংস্থার আওতাভুক্ত করা দরকার। এতে শ্রমিক ও বাগিচা কর্তৃপক্ষ উভয়ের লাভ। শিল্পবিরোধও কমবে। ইংরেজ আমলের প্রথা/দস্তুর যা পরবর্তিতে Pl Act-এ আইনি বন্ধনীতি আনা হলো তা আজ অচল। শিল্প আইন এক্ষেত্রে PL Act যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। সংশোধন করা হোক সংশ্লিষ্ট PC Act সংসদে। চা শ্রমিকের উৎপাদন ভিত্তিক মান মাহিনা, সাপ্তাহিক ছুটি, সি. এল. ই. এল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা উচিত। চা বাগিচার শ্রমিক ঘরের উঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি পরিবারের যোগ্য প্রার্থীরা ম্যানেজারিয়াল পদে নিযুক্ত হওয়া দরকার। ইংরেজ আমলের তৈরি শাসক ও শোষক ও চা কুলি পরিচালনা

ব্যবস্থা চলতে পারে না। স্বচ্ছতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনুষ্যত্ব ও দক্ষ পরিচালনা ছাড়া আগামীদিনে চা শিল্প বাঁচবে না।

প্রয়োজন, কম ইল্ডের চা-বাগিচার জন্য টি-বোর্ডের বিশেষ স্কীমে আর্থিক সাহায্য ও অনুদান। চা-বাগিচার ক্ষেত্রে পিএফ-এর বাকিপড়া পুরানো কেসগুলি বিশেষ স্কিমে এককালীন মার্জনা করে কেবলমাত্র Both Share of Employers & Employer-এর কিস্তিতে জমা দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ আদেশ। তা ছাড়া পিএফ-এর বাকিপড়া বা বাগানগুলি পুরনো বাকি মূল টাকা তার উপর ধার্য সমপরিমাণ জরিমানা ও এত বৎসরের চক্রবৃদ্ধি হারের করের সুদ কোনদিন শোধও করবে না আর ওইসব বাগান লাভজনকও হবে না, চিরদিন অশান্তি শ্রম বিরোধ চলবে।

আমার তো মনে হয় প্রতিটি চা উৎপাদনকারী রাজ্য ও কেন্দ্রেও চা বিষয়ক একজন মন্ত্রী থাকা দরকার। সরকারি ব্যবস্থার সুফল তা হলেই চা শিল্প পুরোপুরি পাবে। বাড়বে বিদেশে রপ্তানি, বিদেশী মুদ্রা আয় সহ ভারতের এত লক্ষ লক্ষ চা সহ বাগিচা সেক্টরের উদ্যোগী ও কর্মচারীদের জীবন সুনিশ্চিত হবে।

ক্ষুদ্র চা সেক্টরেই ভবিষ্যতে চা-বাগিচা সম্প্রসারণ হবে। চায়ের চাহিদা বাড়তে উৎপাদন বাড়ানো দরকার। ক্ষুদ্র চা-বাগিচার মালিকদের জৈব চা চাষ ও চা পর্যটনে উৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সাহায্য করতে পারে। পর্যটন দপ্তর কিংবা টি-বোর্ড বিদেশী পর্যটকদের এইসব ক্ষুদ্র চা বাগানে পর্যটনের জন্য জনপ্রিয় প্রচার দেশে বিদেশে করলে ওইসব ক্ষুদ্র চা বাগিচা পরিবারের দীর্ঘকালীন স্থায়ী জীবন জীবিকার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়। পর্যটনের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা পরিবারের শিক্ষিত যুবক যুবতীদের দিয়ে হোম স্টে কিংবা গ্রাম্য পর্যটন ইত্যাদি অর্থনীতি বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। চাই সরকারি সমর্থন। চাই ক্ষুদ্র চা-বাগিচার জন্য রাজ্য সরকারের জমির প্রশ্নে এন.ও.সি তেমনি চা পর্যটনের জন্য সহজ পথে প্রয়োজনীয় অনুমতি/লাইসেন্স। একথা ভুললে চলবে না, ভবিষ্যতে চা-বাগিচার সম্প্রসারণ উত্তর পূর্ব ভারতেই হবে, কারণ জমি এখানেই পাওয়া যাবে। আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত সহ দক্ষ শ্রমিক ও চা-বাগিচার উপযুক্ত পরিবেশ এখানেই আছে। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আগামীদিনে হয়তো এমন গ্রামগুলি থাকবে না যেখানে শতাধিক পরিবার চা অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। ভারতের চা বিশেষ বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা বিশ্বে সমাদৃত। চা-বাগিচা, চা নিলাম কেন্দ্র, চা ওয়ার হাউস, উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার বিভিন্ন ইনপুট সরবরাহকারী সবাই চা-শিল্পের ভাল চায়। উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে ভ্যালু অ্যাডেড্ চা তৈরির কারখানা-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়া প্রয়োজন। লগ্নীকারী আছে। চাই সিঙ্গলডোর সরকারি আইনি অনুমোদন। জৈব চা উত্তরবঙ্গের মাটিতে ও আবহাওয়ায় উৎপাদন করে সারা বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। ইনস্ট্যান্ট চায়ের জন্য সরকারি সাহায্যে সমবায়ভিত্তিক একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় চা-কারখানা স্থাপন করতে পারলে উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০ কোটি কিলোগ্রাম প্রায় অর্ধেক চা একাজে লাগতে পারে। চা পাতা থেকে একাধিক ঔষধ ও প্রসাধনের কারখানা দুটি-একটি হতেই পারে। ওইসব কারখানায় আর্থিক পুঁজি অনেক প্রয়োজন কিন্তু সরকারি কর ছাড় কিম্বা এ জাতীয় অন্যান্য সুবিধা দিয়ে একাজে উৎসাহিত করতেই পারে। চা শিল্পকে বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের আর্থিক সামাজিক ও শিল্প মানচিত্র কল্পনাও করা যায় না। চা বাগিচা লাভজনক থাকলে চা-শ্রমিক-সহ চা-শিল্পের উপর নির্ভরশীল প্রতিটি মানুষের জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত থাকবে। একটি কথা ভুললে চলবে না। সর্দার বল্লভভাই বলেছিলেন, ''...If there is no water in the well none can draw any to drink.''—

চায়ের চাহিদা আছে, সুতরাং চা শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রাখার দায়িত্ব প্রতিটি উত্তর বঙ্গবাসীর। প্রাচীনকালে ঋষিমুনিরা আয়ুর্বেদাচার্যরা চায়ের গুণাবলী উপকারিতার কথা সংস্কৃত গ্রন্থ 'শালিগ্রামা নিগন্তু ভূষণাঃ' (অনেকটা এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার মতো) চারটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আয়ুর্বেদে চা চারটি নামে সম্বোধিত— 'শ্লেষমারী গীরিভিদ, শ্যামপর্ণী এবং অতন্দ্রি। এখন ওই গ্রন্থের সংস্কৃতে লেখা উপকারিতার কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে সারা বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে। যেমন ''Tea stops congl promoters perspiration, imparts strength, remanis phegm. destroys fever, increases appelite and dispels lassitude.'

স্বাস্থ্যের বন্ধু চা। ভারতীয় আতিথেয়তা অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ চা। চা সংস্কৃতি পবিত্রতার প্রতীক। চা-শ্রমিক, চা-বাগিচা মালিক এবং সরকার সবাই একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা করে একে অপরের পরিপূরক রূপে কাজ করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কৃতজ্ঞতা :

(১) ড. মৃদুল হাজারিকা, উপাচার্য, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, অসম। (২) ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। (৩) দেবব্রত চাকী, Fellow. HRD. GOI. (৪) প্রবীর ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি জেনারেল, টাই, কলকাতা।

সূত্র :

(১) আরণ্যক— ডুয়ার্স উৎসব সংখ্যা— ২০১৪। (২) Planters Chronicle Vol. 106 Nos. 1/4/5/9/12. (৩) TRA/TES/Area Scientific Report 2005]6 to 2012-2013. (৪) Sandar Vallavbhai Patel--Indias Iron Man by Balaraj Krishu 2005 (rifhere (2005). (৫) Moanoramas year Bork--2014. (৬) Universal's labour and Ind-law. (৭) চা— জানা-অজানা- রাম অবতার শর্মা। (৮) চায়ের সাত কাহন—একই। (৯) The Assam Review and Tea News--Vol. 100 to 103. No. 1 to 12 of All years.

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও চা-গবেষক)

বিকল্প জীবিকার স্বার্থে ক্ষুদ্র চা-চাষ

ভীষ্মদেব মেধি

পশ্চিমবাংলার উত্তরভাগ যা উত্তরবঙ্গ নামে পরিচয় বহন করে আসছে, তার উত্তরভাগ অর্থাৎ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার অর্থকরী ফসল হিসাবে 'চা'-এর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা-এর ওপর এই ভূ-ভাগের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে চা-বাগানকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিস্তার ঘটানোর প্রয়াসও শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা-বলয় বলতে আমরা মূলত দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল, তার পাদদেশ অর্থাৎ তরাই এলাকা এবং জলপাইগুড়ি জেলার হিমালয় সংলগ্ন এলাকা, যা ডুয়ার্স নামে পরিচিত— সেই এলাকাকেই বুঝি। এক কথায় চা-বলয় মানেই পার্বত্যবঙ্গ। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে উত্তরবঙ্গের উত্তরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমা এবং কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙা মহকুমায় বহু চা-বাগানের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর এর আধিক্য চোখে পড়ার মতো। চা-শিল্পের সংজ্ঞায় এসব হচ্ছে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা। সমতলের কৃষিজীবী মানুষ তাদের চাষযোগ্য জমিতে কৃষিপণ্যের পরিবর্তে চা-গাছ রোপণ করে অর্থ রোজগারের পথ খুঁজতে সচেষ্ট। কৃষিপণ্যের পরিবর্তে চা-গাছের পাতা বিক্রি করে অধিক মুনাফা লাভই এর মূলে। জীবন- জীবিকার এই নতুন দিশা উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত বিশেষ।

আমরা জানি ভারতবর্ষে চা-বাগিচা কিংবা চা-শিল্প পরিচালনার দায়ভার ন্যস্ত রয়েছে ভারতীয় চা-পর্ষদের হাতে। চা-পর্ষদ তাদের সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র চা-বাগিচার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছে। যে সকল বাগিচার ১০.১২ হেক্টর পরিমাণ জমিতে চা-গাছ রোপণ করা হয়েছে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০.১২ হেক্টর পরিমাণ জমি সম্বলিত চা-বাগিচাকে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা বা ক্ষুদ্র চা-চাষি বলা হয়ে থাকে। মূলত ১৯৯১ সালের পরবর্তীতে বিশ্বায়নের প্রভাবে এই সকল চা-বাগিচা গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় সীমান্ত সংলগ্ন অনুর্বর জমিতে এই সকল চা-বাগিচার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন হলো, এই সকল সমতল ভূমি চা-চাষের উপযোগী কিনা? উৎপাদিত চায়ের গুণগত মানই বা কতটা উন্নত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বৃটিশ শাসিত বাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বনভূমি পরিষ্কার করে যখন একের পর এক চা-বাগিচার গোড়াপত্তন হচ্ছিল তখন এই ভূ-ভাগের পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য কোচবিহারেও চা-চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবার জন্য সমীক্ষা করা হয়। ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত এই সমীক্ষার রিপোর্টে নাকি উল্লেখ ছিল— ''কোচবিহার রাজ্যের ভূমির অবস্থা দৃষ্টে বোধহয় বিশেষ যত্ন করিলে এইখানে চা ও কুসুম ফল জন্মাইতে পারে।'' ওই সময়কালে নাকি কোচবিহারে চা-চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যদিও তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। যদিও পরবর্তীকালে ১৯৪৫ সালে কোচবিহার রাজ্য সরকার রাজ্যে চা-বাগিচা তৈরির লক্ষ্যে একটি আইন পাশ করে, যা 'The Coochbehar Tea Cultivation Control Act 1945 (Act No. 6 of 1945)' নামে উল্লেখিত। এর পর পরই ১৯৪৬ সালে কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙা পরগনার বড় শৌলমারি গ্রামে রাজ্যের একমাত্র চা-বাগানটি স্থাপিত হয়। যা 'কোচবিহার চা-বাগান' নামে পরিচিত। বর্তমান সময়কালেও এই বাগানটিতে চা উৎপাদন হয়ে চলেছে কলকাতার এস পি আগরওয়ালের মালিকানায়। কোচবিহার চা-বাগানে বর্তমানে উন্নতমানের গ্রীন টি উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ এর থেকে প্রমাণিত হয় এই অঞ্চলের সমতল ভূ-ভাগ চা-চাষের উপযোগী।

সমতলে চা-বাগিচার বিস্তারে পরিবেশ বান্ধব চাষ আমাদের মান্যতা পেতে শুরু করেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাবে যখন উষ্ণতা ক্রমবর্ধমান, তখন কৃষিজমিতে ক্ষুদ্র চা-বাগিচার বিস্তার স্বাস্থ্যপ্রদ সুস্থ আবহাওয়া ও পরিচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল টিকিয়ে রাখতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

উত্তরবঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় ভূ-ভাগের সমতল ভূমির এই উপযোগিতাকে পাথেয় করে গত দু'দশকের অধিকাকাল ধরে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরের উত্তর ভাগের সমভূমি এলাকার কৃষি জমিতে ব্যাপক হারে চা-বাগান গড়ে উঠতে শুরু করে। ১০.১২ হেক্টরের কম আয়তন বিশিষ্ট এই সকল ক্ষুদ্র চা-বাগিচা এই এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেরকম অন্যদিকে অলাভজনক চাষ-আবাদের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক জীবনে যন্ত্রণা অনেকটাই লাঘব হয়েছে। বর্তমান সময়কাল এই অঞ্চলের প্রায় লক্ষাধিক পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই সকল ক্ষুদ্র চা-বাগিচার উপভোক্তা। বেশ কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠী আজ চা-চাষে নিয়োজিত। অতি সম্প্রতি তিনটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী জলপাইগুড়ি জেলার যথাক্রমে বেরুবাড়ি, পানবাড়ি ও ভোটপট্টিতে নিজস্ব চা-কারখানা তৈরি করে চা উৎপাদন শুরু করেছে। এই বিষয়টি ক্ষুদ্র চা-বাগিচার ইতিহাসে মাইলস্টোন বটে। উত্তরবঙ্গের বুকে ট্রাডিশনাল কৃষিপণ্যের পরিবর্তে কৃষি জমিতে চা-চাষ হয়তো বহু কৃষিজীবী পরিবারে সচ্ছলতা এনেছে, মুখে হাসি ফুটিয়েছে। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সকলেই চিন্তামুক্ত তা কিন্তু নয়। এর মূলে রয়েছে তাদের জমি সংক্রান্ত জটিলতা।

উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিদের এক বড় অংশ আজও ভারতীয় চা-পর্ষদ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। এর মূল কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি সম্পর্কিত আইনের জটিলতা। কৃষি জমিতে চা-চাষ করলে জমির সরকারি চরিত্র বদলে যায়। এই চরিত্র বদলের জন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কার দপ্তরের এনওসি বা নো অবজেক্শান সার্টিফিকেট। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা এর জন্য লড়াই-সংগ্রাম চালালেও তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এনওসি ব্যতীত ভারতীয় চা-পর্ষদ এই সমস্ত চা-বাগানগুলিকে রেজিস্ট্রেশন দিতে পারে না। বাস্তবে হাজার হাজার চাষি তাদের তিন-চার-দশ বিঘা জমিতে চা-চাষ করলেও তারা চা-পর্ষদ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভে এখনো বঞ্চিত। উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক সময়কাল পর্যন্ত চা-পর্ষদ বা টি বোর্ড কর্তৃক ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সংখ্যা হচ্ছে ৯৯৯০ টি। এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে ৬৯৯৫টি এবং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ২৯৯৫টি। সাম্প্রতিককালে মালদহ জেলাতেও ক্ষুদ্র চা-বাগিচা গড়ে উঠছে। স্থাপিত হচ্ছে সমবায়ভিত্তিক চা উৎপাদন কারখানা। উত্তরবঙ্গ জুড়ে চা-চাষের বিস্তার কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলা যেতে পারে।

তবে সাম্প্রতিককালে চা-বাগিচায় চা-চাষ, জৈব চা উৎপাদন ইত্যাদির পাশাপাশি চা পর্যটন একটি নতুন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে সমতলে চা-বাগিচার বিস্তারে পরিবেশ বান্ধব চাষ আমাদের মান্যতা পেতে শুরু করেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাবে যখন উষ্ণতা ক্রমবর্ধমান, তখন কৃষিজমিতে ক্ষুদ্র চা-বাগিচার বিস্তার স্বাস্থ্যপ্রদ সুস্থ আবহাওয়া ও পরিচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল টিকিয়ে রাখতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তবে শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা-চাষের বিস্তার একদিকে যেমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষিদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে, সেরকম পরিবেশ রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হয়েছে, যা অবশ্যই স্বস্তিদায়ক।

তথ্যসূত্র :

১. চা— জানা অজানা। রাম অবতার শর্মা।

২. চায়ের সাতকাহন। রাম অবতার শর্মা।

৩. উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সাধারণ সভার প্রতিবেদন।

৪. বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র।

৫. উত্তরপ্রসঙ্গ, এপ্রিল ২০১৪ সংখ্যা : সম্পাদনা : দেবব্রত চাকী, কোচবিহার।

পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে *বিরচিত*

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (১২ খণ্ডে)

তত্ত্বগত আলোচনা, স্বরলিপি, স্বরবিস্তার ও তালসহ বাংলায় অনূদিত। ২৪৩৫

ড. উৎপলা গোস্বামী

পূর্বতন অধ্যক্ষা বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্বতন ডিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ২৫০

বাংলা গানের বিবর্তন ৩০০

পন্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস

ঠুমরী লহরী (তিনখণ্ডে) ৫৭৫

ঠুমরীর তত্ত্বগত আলোচনা, গায়ন পদ্ধতি, সমস্ত ঘরানার গায়কী ও গান। শতাধিক রাগে ৪৫০টি ঠুমরী গানের তালসহ স্বরলিপি।

গজল-এ-গুলিস্তাঁ ১৫০

তত্ত্বগত আলোচনা ও পঞ্চাশটি চিরায়ত গজল স্বরলিপি তাল সহ।

সপ্ততন্ত্রিকা তত্ত্ব (চারখণ্ডে) ২৭৫

সেতার, সরোদ, বেহালা ও অন্যান্য তারযন্ত্র বাদনের আকরগ্রন্থ। প্রতিটি রাগের উপর বিভিন্ন তালে প্রায় পঞ্চাশটি করে গৎ। তত্ত্বগত আলোচনা সহ।

তবলা বোধিকা (১ম) ১৫০

রাগতন্ত্রমালা (১ম) ২৫০

মহামতি অহোবল পণ্ডিত *বিরচিত*

সংগীত পারিজাত ১৫০

সংগীতশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মূল ও টীকা সহ সরল বঙ্গানুবাদ।

মণিকা সাহা *সম্পাদিত*

আগ্রা ঘরানা ১৩০

আগ্রা ঘরানার ইতিহাস। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সহ আগ্রা ঘরানার অন্যান্য নায়কদের জীবনী, গায়কী। ঘরানার প্রায় সমস্ত গান স্বরলিপি তাল ও স্বরবিস্তার সহ। বাংলায় অনূদিত।

গীতশ্রী গীতা সোম *সম্পাদিত*

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা (মীরা বাঈ)

(১মখণ্ড—৮৪টি রাগে) ১৬০

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা (২য়খণ্ড)

(ভক্তিগীতি তাল ও স্বরলিপি সহ। ৫৪টি রাগে) ১২০

জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, রুইদাস, রামদাস, ব্রহ্মানন্দ, হরিদাস, মলুকদাস, নরসী মেহতা ও সুখানন্দ।

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা (৩য়খণ্ড)

(ভক্তিগীতি তাল ও স্বরলিপি সহ। ৫৪টি রাগে) ১৩০

তুলসীদাস, নানক, দাদুদয়াল, আমীর খুসরো, তানসেন, বৈজুবাওরা, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, দরিয়া সাহেব, ইয়ারা সাহেব, সুন্দরদাস, রসখান, দুনীদাস।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র নারায়ণ দত্ত

রাগসঙ্গীত ও প্রাচীন ভারত ১৭৫

প্রাচীন বৃহৎ ভারতবর্ষে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের উৎস সন্ধান।

তাপস আদিত্য, সংগীত কলানিধি

কণ্ঠসংগীত মধ্যমা ১৩০

মাধ্যমিক সংগীত পরীক্ষার শাস্ত্রীয় ও ক্রিয়াত্মক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত একমাত্র পুস্তক। দশ বৎসরের প্রশ্নোত্তর সহ।

সুবোধচন্দ্র নন্দী, সংগীতশাস্ত্রী

উচ্চমাধ্যমিক সংগীতসুধা ১৫০

উচ্চমাধ্যমিক সংগীত পরীক্ষার শাস্ত্রীয় ও ক্রিয়াত্মক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত একমাত্র পুস্তক।

সংগীতসুধা (১ম) ১০০ **সংগীতসুধা** (২য়) ১৩৫

প্রায় সমস্ত সঙ্গীত শিক্ষা সংস্থার পাঠক্রম অনুসারে লিখিত।

দীপায়ন

২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯

☎ ২২৪১-৪১৫০

E-mail : deepayan07@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোরস, দে'জপাবলিশিং, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মহেশ লাইব্রেরি

পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সংসার সুখের হয়

আঁখি মহাদানী মিশ্র

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'— এমন কথা প্রচলিত থাকলেও সংসারে সুখের মূল চাবিকাঠিটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত থাকে। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তো আছেই। দুটি ছেলে মেয়ে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে— তা সে যে ধর্মেই হোক না। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে সংসার গাড়ির দুই চাকা হয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হিন্দু মতে বিবাহ হলো পবিত্র বন্ধন। দেবতাকে সাক্ষী রেখে, মনকে শুদ্ধ করে বহু কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরিণত বয়সের ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকা ও সংসার চালানোর অঙ্গীকার নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়ে সমাজ ও সংসারকে দেয় মানব জীবনের উত্তরাধিকার। এর ফলে সমাজ আরো এগিয়ে যায়। পাশ্চাত্যে এই বিবাহ এক চুক্তি, কিন্তু যেখানে এত পবিত্রতা সেখানে কেন ঘটে এই বিবাহবিচ্ছেদ?

বিচ্ছেদ হবে বলে কেউ কোনোদিন একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করে না। তবে কী

এমন ঘটে যাতে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কখনো একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার অভাব, কখনো বা, অসহিষ্ণুতা কখনো বা শারীরিক মানসিক অত্যাচার এই বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে এই বিবাহবিচ্ছেদ চুক্তিভাঙার কারণে হামেশাই হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না বললেই চলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক না থাকলেও কখনো সন্তানের জন্য, কখনো পরিবারের জন্য, কখনো আর্থিক সঙ্গতি, কখনো বা নিরাপত্তার অভাবে তারা একই ছাদের তলায় থাকে। তবে বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। উচ্চ সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ সহজেই হয়। কারণ সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আর্থিক সঙ্গতি অনেকটা সহায়। তাছাড়া তাদের জগৎ আলাদা আলাদা। যখন মতবিরোধ ঘটে তখনই ভেঙে যায় এই সম্পর্ক, সূচনা হয় বিবাহ- বিচ্ছেদের। নিম্নবিত্ত সমাজে আইনগত বিবাহ-বিচ্ছেদ না হলেও সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেখা যায় হামেশাই। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কখনো স্ত্রী ঘর ছাড়ে এবং সঙ্গতি একটাই— অপরের ঘরে কষ্ট করে দিনযাপন করার। আবার কখনো স্বামী জোর করে তাড়িয়ে দেয় স্ত্রীকে। যেখানে পুরুষরাই প্রধান সেখানে এক অসহায় নারীর কিছু করার থাকে না। বাধ্য হয় সে অপরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে জীবনযাপন করতে। নীতিবোধের অভাবে কখনো বা পরনারী বা পরপুরুষে আকৃষ্ট হয়ে সংসার ভাঙে, ফল স্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদ।

তবে মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তার প্রধান ও অন্যতম কারণ নারীর পরনির্ভরশীলতা। স্বামী যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে যায় না। কারণ সে স্বনির্ভর নয়। তাছাড়া সমাজে এখনো বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি থাকা নিয়ে নানা অসম্মানজনক কথা হয়। সেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ হিসাব মেয়েকেই দায়ী করে সমাজ। তাছাড়া রয়েছে সংস্কৃতির শিক্ষা— যেখানে ছোট থেকেই আমরা শিখি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের, তাই এই বন্ধন থেকে সহজেই আমরা মুক্ত হতে পারি না। তাছাড়া এই সমাজ বিবাহবিচ্ছেদ হলে মেয়েদের নিরাপত্তা খণ্ডিত হয়, সংসার চালানো কষ্টকর হয়। মেয়েরা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছলতা নয়, আবার দাসীবৃত্তি গ্রহণও করতে পারে না তারা। তাই সাধারণ সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক কম। যখন আর কোনোদিক থেকেই টিকিয়ে রাখা যায় না সম্পর্ককে তখন বাধ্য হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ■

পাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গ

সাজেশন্ — নবম-দ্বাদশ

সুপার নোটস্ বেস্ট সাজেশন, S. Roy সম্পাদিত UTTARAN PROKASHANI প্রকাশিত লেটার মার্ক এ$^+$ বই।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত বহু শিক্ষক/ শিক্ষিকার প্রশংসাপ্রাপ্ত ৮০% থেকে ১০০% কমন দিতে সিদ্ধস্থ একমাত্র সাজেশন্ বই লেটারমার্ক এ$^+$ পড়ুন ও নিশ্চিন্তে পাশ করুন। প্রতি বই-এর মূল্য ৫০ টাকা।

গণিত

লোয়ার শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ঋক প্রকাশনীর সোনালী গণিত সম্পূর্ণ কালার অত্যাধুনিক গণিত বই। মূল্য ৬০ টাকা।

শিশু রচনা

রচনা বই :- দ্বিতীয় শ্রেণী হতে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য। এই শ্রেণীর শিশুদের সমস্ত প্রকার পরীক্ষার জন্য শুধু একটি রচনা বই নয়, রচনার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ আমাদের লক্ষ্য। আমরাই প্রথম জন্মজাত দেশভক্ত ডাক্তারজীকে শিশু রচনা বই-এ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রাপ্তিস্থান

এজেন্সীর জন্য বা ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন ঃ চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ৮/সি, ট্যামার লেন কলকাতা-৯। মোঃ- 9832043515 / 9635754004

রাজনৈতিক নেতা ও বিচারকদের বিপজ্জনক জোটবন্ধন

অতিথি কলম

যোগীন্দর সিং

বিচারবিভাগের মধ্যে দুর্নীতি নিয়ে নিজের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু সম্প্রতি লিখেছেন : ''মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক অতিরিক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে। তিনি তামিলনাড়ুতে সরাসরি একজন জেলা বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং জেলা বিচারক হিসেবে অন্তত আটটি ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে

> ভালো প্রশাসন সুস্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধ সরকারের অন্যতম চাবিকাঠি। একইসঙ্গে এর জন্য প্রয়োজন বিচার ব্যবস্থাকে শক্ত-সমর্থ করে তোলা, তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করা। এই বিচারব্যবস্থা জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

বিমুখ-মনোভাব ব্যক্ত করেছেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিভিন্ন পদাধিকারী বিচারপতিরা। কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তাঁর কলমের একটিমাত্র আঁচড়ে এইসব বিমুখ মনোভাবকে কেটে দিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তিটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন। তিনি যখন ওই পদে ছিলেন তখন আমি ২০০৪-এর নভেম্বরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হই।''

শ্রী কাটজু যোগ করেছিলেন, যে পূর্বোক্ত বিচারক অশোক কুমার এ ব্যাপারে তামিলনাড়ুর এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার জোরদার সমর্থন পেয়েছিলেন। শ্রী কাটজু এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, যেহেতু জেলা আদালতে তাঁর কার্যকালের সময় শ্রীকুমার ওই রাজনৈতিক নেতার জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছিলেন, তাই এই সমর্থন। যদিও শ্রী কাটজু তারপরেও কুমারের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ নিয়ে ক্রমাগত বহু রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, এমনকী ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রী আর সি লাহোটিকে অনুরোধ পর্যন্ত করেছেন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

শ্রী কাটজু বলেছেন যে তিনি পরে জেনেছিলেন আদতে ঠিক কী ঘটেছিল। আই বি-র বিরুদ্ধ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেছিলেন যে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে দু'বছরের কার্যকাল শেষে অশোক কুমারের এই মেয়াদ যাতে আর বাড়ানো না হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তামিলনাড়ুর ডিএমকে-র নেতারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে কুমারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকূল ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। প্রসঙ্গত, এই ডি এম কে-র সমর্থনের ওপর তখন জোট সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করছিল। শ্রী লাহোটি এই বিতর্কিত বিচারকের আরও একটি কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

যদিও শ্রী লাহোটি শ্রী কাটজুর এই দাবিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বক্তব্য 'বিচারপতি কাটজু কখনোই, কোনো সময়ই আমাকে লেখেননি যে অশোক কুমার দুর্নীতিগ্রস্ত কিংবা তাঁকে যাতে স্থায়ী করা না হয়'। তিনি আরও বলেছেন, 'বিচারপতি কাটজু মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি অশোক কুমারের স্থায়ীকরণের সুপারিশ প্রত্যাহার করে নিতে চাইলেই তা পারতেন, যদি কুমার দুর্নীতিগ্রস্তই হতেন এবং তা হলেই পুরো ব্যাপারটা মিটে যেত।'

ভারতের আরেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী কে জি বালাকৃষ্ণণ একইভাবে কাটজু-র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। কাটজু-র অভিযোগকে তিনি 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই খবরটিকে পুরোপুরি জঞ্জালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন যাতে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি ও ভারতের অন্য দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইউপিএ-র আমলে তামিলনাড়ুর এক কলঙ্কিত বিচারপতিকে পুনর্বহাল করতে 'অনৈতিক সমঝোতা' করেছিলেন। শ্রীবালাকৃষ্ণণ আরো বলেছেন : 'এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক চাপ বা ওই জাতীয় কিছু কিংবা

কোনো দুর্নীতির অস্তিত্ব ছিল না। তিনি (কাটজু) কী বলেছেন আমি জানি না।'

যাই হোক, শ্রী এইচ কে ভরদ্বাজ, যিনি এই ঘটনার সময় কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন কোনো না কোনো ভাবে শ্রী কাটজু-র দাবিকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন : 'ডি এম কে ছিল ইউপিএ-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক এবং সেই দলের সাংসদেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন আমার কার্যালয়ে। তাঁরা বলেছিলেন, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারক বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছেন।' শ্রী ভরদ্বাজ একই সঙ্গে নিশ্চিত করেছিলেন যে ডিএমকে দলের মন্ত্রিসভায় তাঁর সহযোগীরা তাঁকে অনুরোধ পর্যন্ত করেছিলেন যাতে অশোক কুমারের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়। এবং সেই জন্য তিনি নিজেই তখন শ্রী লাহোটি-কে এক চিঠি লিখে মেয়াদ-বৃদ্ধির কথা বলেন।

অন্যভাবে বলা যায়, যেহেতু ডিএমকে ছিল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জোটসঙ্গী, শরিক; সুতরাং তাদের এরকম কোনো অনুরোধ যা সাধারণ নয়, তা মানতে সরকার বাধ্য ছিল। তবুও শ্রী ভরদ্বাজ অশোক কুমারের কোনো কলঙ্ক ছিল— শ্রী কাটজুর অভিযোগ এমন খারিজ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিচারপতি অভিযুক্ত নিয়োগ কোনো পারিবারিক বিষয় নয়। তিনি এও বলেছেন, প্রধান বিচারপতি কুমারের বিরুদ্ধে তদন্ত করেছেন ও তাঁকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়েছেন। এই দাবি ও পাল্টা দাবি মামলাটিকে কোনো সমাধানে পৌঁছে দিতে পারেনি। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সত্য, যে কোনো আমলেই যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন তাঁরা যা খুশি তাই করতে পারেন। কখনো এইসব কাজকর্ম আইনের সূক্ষ্ম-বাছবিচারের বস্ত্রে আবৃত থাকে, আবার কখনো জাতীয় স্বার্থের মোড়কে তা পরিবেশিত হয়। রাজনীতিবিদরা ভালোই জানেন যে জনগণের স্মৃতিশক্তি খুব কম। কিন্তু স্মৃতি ফিরিয়ে আনার এটাই উপযুক্ত সময়। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্বতন সরকার চেয়েছিল অপরাধ তথ্য-প্রমাণাদির হাত থেকে সাংসদদের রেহাই দিতে একটি অধ্যাদেশ জারি করতে। কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীকে আদর্শবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য এটা খুব জরুরি ছিল। যিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন এই অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলা উচিত।

জনগণের সেবক হিসেবে এই কলমচিকেও রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল— যখন খাদ্য দুর্নীতির বিষয় সে তদন্ত করছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর তালে তাল না মেলানোয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই) থেকে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল। জন-আচরণবিধির কথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তাকে উৎসাহিত করা হয়। কয়েকজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের কথা বাদ দিলে, অধিকাংশ রাজনীতিবিদের ক্ষেত্রেই 'আচরণবিধি', 'নৈতিক আদর্শ', 'মান্যতা'-র মতো শব্দগুলি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন ধরা যাক, সরকারি বাংলো যাঁদের জন্য ধার্য করা হয়েছে, তাঁরা হয়তো নয়াদিল্লীতে এ ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার আওতায় পড়েনই না। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার যার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে পর্যন্ত ভ্রূ-কোঁচকাতে হয়েছে। একইভাবে, ইউপিএ-র আমলে এক রাজনীতিবিদ প্রকাশ্যে দোষারোপ করেছিলেন তাঁর কন্যাকে টু-জি কেলেঙ্কারি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করা হয়নি বলে। এর প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল যে মামলাটি অ্যাপেক্স আদালতের পর্যবেক্ষণাধীনে রয়েছে। মানুষ এখনও ভোলেননি কেমন করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী কুমারের মন্ত্রিত্ব গিয়েছিল, কয়লা-ব্লক দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই রিপোর্টের ওপর রীতিমত 'ডাক্তারি অস্ত্রোপচার' চালানোর জন্য। কিংবা একইভাবে রেলমন্ত্রী থেকে কীভাবে শ্রী পবন কুমারকে সরতে হয়েছিল— ভারতীয় রেলে এক আধিকারিককে উচ্চপদে উন্নীত করার জন্য তাঁর ভাইপোর ঘুষ খাওয়ার কারণে।

শ্রী কাটজুর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ তবু সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারটা পরীক্ষা করেছেন। যাই হোক, প্রাক্তন বিচারক (শ্রী কাটজু) নিশ্চিতভাবেই ঝুলি থেকে বেড়াল বের করে দিয়েছেন এবং এটা করে তিনি জনগণের অশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বিচার-ব্যবস্থার মাথায় বসে তিনি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন এবং জাতীয়স্তরে বিষয়টিকে কথা বলার জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন। ভালো প্রশাসন সুস্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধ সরকারের অন্যতম চাবিকাঠি। একইসঙ্গে এর জন্য প্রয়োজন বিচার ব্যবস্থাকে শক্ত-সমর্থ করে তোলা, তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করা। এই বিচারব্যবস্থা জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যাইহোক, বিচারব্যবস্থা যেভাবে তার কর্তব্য পালনে সক্রিয় হয়েছিল, তা দিকচিহ্ন স্বরূপ হয়ে থাকবে।

(লেখক সিবিআই-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ; সৌজন্যে : পাইওনীয়ার)

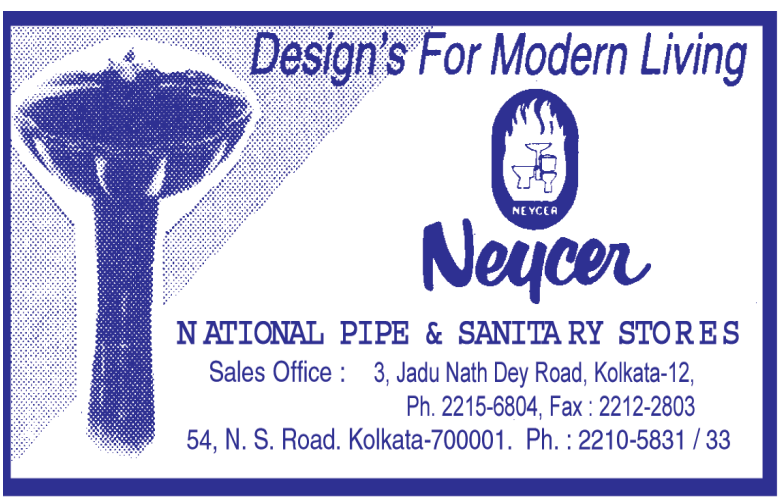

গো-পাচার

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে মোদী সরকার

সাধন কুমার পাল

বহুবিধ উপযোগিতার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতিতে গো-প্রজাতি-কে বিশেষ আদরের, শ্রদ্ধার, যত্নের আসনে বসানো হয়েছে। এই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভারতীয় সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির ৪৮ নং ধারায় বলা হয়েছে "the state shall endeavour to organise agriculture and animal husbandary on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle"। সংবিধানের এই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বাদে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচুর্য সত্ত্বেও এদেশের গো-সম্পদ রপ্তানি বাণিজ্যের আওতায় আসার বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভারতের এই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আইনি ও বাণিজ্যিক অবস্থানের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। তথ্য বলছে, ভারত থেকে বাংলাদেশে গবাদি পশুর অবৈধ চোরাকারবারে বছরে কমপক্ষে ৫০০ মিলিয়ন ডলার আদান প্রদান হয়। ব্যাপক চাহিদার জন্য ভারত থেকে প্রতিদিন চোরাপথে গড়ে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার গোরু যার আর্থিক মূল্য ৮১ হাজার ডলারের আশেপাশে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মতে গবাদি পশুর চোরাকারবারের ঠেলায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। বলদের অভাবে ক্ষুদ্র চাষিরা চাষ করার জন্য পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টরের মতো ব্যয়বহুল ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে নিয়মিত চাষ করতে পারছেন না। মার খাচ্ছে উৎপাদন। গোবর সারের অভাবে চাষের জন্য রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা জমির উর্বরতা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ গোরু পাচার হওয়ার ফলে গোরুর পায়ের চাপে নষ্ট হচ্ছে বিঘের পর বিঘে জমির ফসল। এ সবের প্রতিবাদ করলেই মিলছে ডাকাতি ও খুনের হুমকি, ঘটছে ধর্ষণের মতো ঘটনাও।

এভাবেই প্রতিনিয়ত চলছে গো-পাচার।

গত ১৬ জুলাই ২০১৪ 'জাতীয় কণ্ঠ' নামে এক বাংলাদেশি সংবাদপত্রের কলকাতার প্রতিনিধি জয়দেব দাসের রিপোর্ট ছেপেছে। তাতে বলা হয়েছে "...বাংলাদেশে গোরু পাচার বসিরহাটের মানুষের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীমান্তে গরিব কৃষকদের ফসল নষ্ট করে গোরু নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করলে পাচারকারীরা খুন-জখম এমনকী মহিলাদের সম্ভ্রমহানির মতো ঘটনাও ঘটাচ্ছে। প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়ে বড় বড় লরি ভর্তি করে প্রতিদিন হাজার হাজার গোরু নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুলিশের ভূমিকা দর্শকের। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গোরুপাচারের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ। পাচারকারীরা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, স্বরূপনগরে গোরু পাচারে বাধা দেওয়ায় পাচারকারীদের হাতে বিএসএফ জওয়ান খুন হয়েছেন। হাকিমপুরে ভাঙচুর হয়েছে সীমান্তরক্ষীর চৌকি। কৈজুড়ি গ্রামে গোরু পাচারে বাধা দেওয়ায় দুই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়, তিন কিশোরীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এক মহিলাকে খুন পর্যন্ত হতে হয়েছে পাচারকারীদের হাতে। ঘোজাডাঙায় পাচারকারীদের হুমকির কথা পুলিশ-প্রশাসন, এমনকী শাসকদলের নেতাদের জানিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছে না।"

বাংলাদেশের আরেকটি সংবাদপত্র 'আমার দেশ'-এ (৬ অক্টোবর ২০১৩) প্রকাশিত আরেকটি রিপোর্টের অংশ বিশেষে চোখ রাখলে ভারত থেকে গোরু পাচারের ভয়াবহ চিত্র ও এ ব্যাপারে ওই দেশের আইনি অবস্থান সম্পর্কে খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। রিপোর্টিতে

বলা হয়েছে, ''রংপুর : কোরবানির ঈদকে টার্গেট করে রংপুর অঞ্চলের সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিনই শত শত ভারতীয় গোরু প্রবেশ করছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী হাটগুলোতে। এসব গোরু এ অঞ্চল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাড়ি জমাচ্ছে। এতে করে দেশীয় গোরু ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে রয়েছে। এদিকে ভারতীয় গোরু বিনা করিডোরে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, এক শ্রেণীর দালাল সীমান্তে কর্মরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর অসাধু কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে এসব ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অবৈধ এ অর্থের ভাগ চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের বড়বাবুদের কাছে। সীমান্ত এলাকার একাধিক সূত্র জানিয়েছে, রংপুর অঞ্চলের কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, কচাকাটা, ফুলবাড়ি, রৌমারী, রাজিবপুর, চিলমারী, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, নীলফামারীর ডিমলা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় এবং দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে আসছে এসব গোরু। সূত্রটি জানিয়েছে, এসব স্পট দিয়ে প্রতিদিন ভারতের কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে কাঠের তক্তা বসিয়ে চোরাকারবারিরা শত শত ভারতীয় গোরু পাচার করে আনছে।

বেশ কয়েকবার ঊর্ধ্বতন মহলের চাপের কারণে কিছু গোরু আটক করে বিজিবির সদস্যরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সীমান্ত পার হয়ে আসার পর চোরাকারবারিরা বিজিবির টোকেন নিয়ে কাস্টমস অফিসে গোরু প্রতি ৫০০ টাকা করিডোর ফি জমা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও সেটি মানা হচ্ছে না। ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। চোরাকারবারি ও অসাধু কিছু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অঙ্কের টাকা। সীমান্তের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, কথিত লাইনম্যান (সোর্স) পাচার হয়ে আসা গোরু প্রতি ২৫০ টাকা বিজিবির কথা বলে বিনা করিডোরে গোরু পাচার করে দেওয়ার সহযোগিতা করছে।

দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গোরুর হাট ঘুরে দেখা গেছে, বাজার দখলে রয়েছে ভারতীয় গোরুর। দেশীয় গোরুর চেয়ে একটু মোটা তাজা হওয়ায় ক্রেতারা ভারতীয় গোরুর দিকে ঝুঁকছেন বেশি। দামও তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে ভারতীয় ওই সব গোরুর। এ কারণে দেশীয় খামারিরা চরম বিপাকে রয়েছেন। আশঙ্কা করছেন এখনই গোরুপাচার বন্ধ না করলে দেশের ক্ষুদ্র গোরু খামারিরা পথে বসবে। লোকসান হবে লক্ষ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে রাজস্ব বঞ্চিত হবে সরকার...।''

এই রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারত থেকে গোরুপাচার বাংলাদেশের অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ১৯৯৩ সালে আইন পাশ করে বাংলাদেশ গোরুর ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যম হিসেবে দেখতে শুরু করে। ফলে সীমান্ত পার হলেই গোরুচোর গোরু ব্যবসায়ী হয়ে যায়। ওই দেশের কাস্টমসকে 'সীমান্তে ঘোরাফেরা করার সময় পাওয়া গেছে এরকম ঘোষণা করে গোরু প্রতি ৫০০ টাকা চার্জ দিলেই সেটি বৈধ হয়ে যায়। শুধু রাজস্ব আয় নয় বিশ্বের ৫০টি দেশে বাংলাদেশে বোন চায়নার সামগ্রী রপ্তানি করে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

তথ্য বলছে, বাংলাদেশের কসাইখানাগুলিতে প্রতি চারটে গোরুর মধ্যে তিনটে গোরু ভারতের। রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশ ২০০৮-০৯-এ ৩৮১.১৪ মিলিয়ন ডলারের চামড়া, ২০০৯-১০-এ ৩০.৭৮ মিলিয়ন ডলারের বোন চায়না সামগ্রী ও ২০১১ সালে ৩.৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের গো-মাংস রপ্তানি করেছে। আবুধাবি, দুবাই-এর মতো পৃথিবীর অনেক দেশের উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন বিফ, প্যারিসের ফ্যাসানেবল চামড়ার ব্যাগ, ইটালিয়ান চামড়ার জুতোর একটি বড় অংশই বাংলাদেশের এই রপ্তানি বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। দুর্নীতি ও মানব জাতির সত্যবাদিতা ও সমতা নিয়ে কর্মরত 'রুপান্তর' নামে খুলনাভিত্তিক একটি এনজিওর কমিউনিকেশন ডিরেক্টর আমিনুল এহসানের মতে কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের নিরিখে চোরাকারবার বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প।

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের নদী, ঘন বসতিযুক্ত এলাকার যে সমস্ত অঞ্চলে এখনো কাঁটাতারের বেড়া নেই মূলত সেই সমস্ত অঞ্চল গোরুপাচারের আদর্শ জায়গা। তবে কাঁটাতারের বেড়া, বিএসএফের প্রহরা সীমান্ত অপরাধীদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাচ্ছে। দশ ফুট উঁচু বেড়ার উপর বা নীচ দিয়ে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন বুদ্ধি খাটিয়ে যেমন উপর দিয়ে কপিকলের সাহায্যে, বেড়ার নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে বা জল নিকাশি নালা দিয়ে, অবাক করে দেওয়ার মতো বুদ্ধি খাটিয়ে নিঃশব্দে বেড়া কেটে, আশ্চর্য হওয়ার মতো বিভিন্ন সঙ্কেতের সাহায্যে বিএসএফের উপস্থিতি অনুপস্থিতি জানান দিয়ে গোরুপাচার হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া তথ্য বলছে কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে পরিবহনযোগ্য বাঁশ কাঠের তৈরি কপিকলের সাহায্যে একটি পূর্ণবয়স্ক গোরু পার করতে বড় জোর ৪০ সেকেন্ড সময় লাগে। অর্থের প্রলোভনে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ান একটু চোখ ঘুরিয়ে রাখলে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০টি গোরু কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে পার করা কোনো ব্যাপারই নয়। যে জওয়ান অর্থের লোভের ফাঁদে পা দেবে না তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে নানা অজুহাতে আক্রমণ নামক মৃত্যুফাঁদ। তথ্য বলছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ৬৮টি গোরু পাচারের করিডর ও ১৪৯টি স্পর্শকাতর গ্রাম রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হওয়া পাচারকারীদের থেকে এটা জানা গেছে যে গোরুপাচার চক্রের সঙ্গে পরিপূরকভাবে কাজ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও জালনোট পাচারচক্র। যেমন, ৩ হাজার টাকা বাজার দরের গোরুর মূল্য হিসেবে দশ হাজার টাকার জাল ভারতীয় নোট দেওয়া হয়। এই পাচার প্রক্রিয়ার স্বার্থেই জড়িয়ে আছে মানুষ পাচার, সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও আর ডি এক্সের মতো বিস্ফোরক দ্রব্যাদির চালান। ২০০৮ সালে উত্তরপ্রদেশে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি হুজি জঙ্গি পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে যে সে গোরুপাচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির জন্য অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদও সরবরাহ করতো।

প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক, সাংবিধানিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়ে, জালনোট ছড়িয়ে দেশের অর্থনীতিতে বিপন্ন করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই অবৈধ ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকার পেছনে মূল চালিকাশক্তি কি? এর কি কোনো সুরাহা নেই? যদি সুরাহা না থাকে তাহলে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, এই বেড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিদিন মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করা ও প্রশিক্ষিত বাহিনী দিয়ে সীমান্ত রক্ষার নামে এত আয়োজন কেন?

এই প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। এক, অর্থনৈতিক। দুই, ভারত ও বাংলাদেশের

সম্পর্কের স্পর্শকাতরতা। অর্থনৈতিক কারণের জন্য ভারত থেকে বাংলাদেশে গোরুপাচার বন্ধ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হরিয়ানায় যে গোরুর দাম ৫০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় সেটির দাম ৫ হাজার টাকা আর বাংলাদেশে ওই দেশের টাকায় সেটির মূল্য ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। মূল্যের এই বিরাট পার্থক্যের জন্য পাচারকারিরা তাদের পথে বিএসএফ বা স্থানীয় প্রশাসনের যে কোনো বাধা অর্থ দিয়ে দূর করতে পারে। সীমান্তে কান পাতলেই শোনা যাবে পাচারকারিরা মোটা অঙ্কের মাসোহারা দেয় বিএসএফ, পুলিশ, স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী ক্লাব, পুজো, সামাজিক অনুষ্ঠানের হোতাদের। পাচার করার সময় সীমান্ত গোরু নিয়ে সামান্য পথ হেঁটে স্থানীয় মানুষ আধ ঘণ্টা থেকে একঘণ্টা কাজ করেই ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা রোজগার করতে পারে। অর্থের জন্যই পাচারকারিদের সহযোগীর একটি ভালো অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের।

কাঁটাতারের বেড়া সাধারণত সীমানা পিলার থেকে ১৫০ মিটার দূরে থাকে। এই বেড়া কোথাও জিরো লাইন থেকে ৬০০ মিটার দূরে আছে। সীমান্ত এলাকার চাষিদের বিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে। বিধিনিষেধের জন্য এই জমিতে পাট বা ভুট্টার মতো অর্থকরী ফসল ফলাতে পারে না সীমান্তের চাষিরা। জিরো লাইন ঘেঁষে বাংলাদেশিরা সেচের জন্য সেলো ইত্যাদি বসালেও বিএসএফের বাধার জন্য ভারতীয় চাষিরা পারে না। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পেটের দায়ে সীমান্তের চাষিরা বেড়ার ওপারে ধান, গম বা শাকসব্জির মতো ফসল ফলালেও বাংলাদেশি চোরেরা তা কেটে নিয়ে যায়। ফলে অনেক জায়গাতেই ভারতীয় সীমান্তের চাষিরা এখন কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে জমি বাংলাদেশিদের দিয়ে ভাগচাষ করাচ্ছে। সহজেই বাড়তি রোজগারের জন্য সীমান্তের চোরাকারবারি, গোরুপাচারকারিদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে বেঁচে থাকার মতো রসদ যোগাচ্ছে। শুধু বেঁচে থাকার মতো রসদই নয়, গোরুপাচারের করিডরগুলিতে আর্থিক সমৃদ্ধিরও ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে। সহায়ক হিসেবে কাজ করতে করতে অনেক সীমান্তবাসী গোরুপাচারের জন্য নিজস্ব পিকআপ ভ্যানের মালিক পর্যন্ত হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে রমরমিয়ে চলা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল দেখিয়ে দিচ্ছে চোরাকারবার শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে এখন এলাকার সমৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। অর্থের জোরে পাচারকারিদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এতটাই যে এদের অনৈতিক কাজের প্রতিবাদকারীরাই একঘরে হয়ে যায়। এরা অত্যাচারিত হলে পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ থাকে না।

কৃষিকাজের প্রয়োজনে ভারতে গবাদি পশু পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট আইন আছে। ট্রান্সপোর্টেশন অফ অ্যানিমেল রুল ১৯৭৮-এর আর্টিক্যাল ৫৫-এ বলা আছে, 'an ordinary goods wagon shall carry not more than ten adult cattle or fifteen calves on broad gauge and not more than four adult cattle or six calves on narrow gauge'। কিন্তু বাস্তবে এক একটি ওয়াগানে তিনশোর উপর গোরু নিয়ে যাওয়া হয়। দিনের পর দিন এত বড় অনিয়মও আইন রক্ষকদের চোখে পড়ে না বলে এখন আসমুদ্র হিমাচল গোরু পাচারকারিদের নেটওয়ার্কের আওতায়। কথায় বলে, পয়সা দিলে কিনা হয়!

কপিকলের সাহায্যে কাঁটাতারের ওপর দিয়ে এভাবেই চলে পাচার।

বাংলাদেশের কাছে ভারত থেকে পাচার হওয়া গোরুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বোধহয় তিস্তার জল কিংবা ছিটমহল বিনিময়ের চেয়েও বেশি। কারণ এই পাচার-শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ প্রতিদিনের অর্থনৈতিক কারণ ও বহু মানুষের জীবিকার প্রশ্ন। এজন্যই সীমান্তে বিএসএফ একটু কড়া হলেই বাংলাদেশি মিডিয়া থেকে শুরু করে হইচই হয় বাংলাদেশের সংসদেও। প্রভাব পড়ে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে হলে ভারতকে সীমান্ত শিথিল করতে হবে এটাই যেন ওই দেশের পক্ষে অকথিত অলিখিত শর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে নজিরবিহীন সমঝোতা করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার তাগিদে ২০১১ সালে বিএসএফের গুলিতে সীমান্ত (পড়ুন বাংলাদেশি পাচারকারিদের হত্যা) হত্যা কমিয়ে আনার জন্য ইউপিএ সরকার বিএসএফের হাতে নন-লেথেল অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছে। এতে তথাকথিত সীমান্ত হত্যা কমলেও চোরাকারবারি পাচারকারিরা আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ফলে সীমান্ত বসবাসকারী নিরীহ ভারতীয় এ বিএসএফের উপর আক্রমণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল যে ভারত নতুন আইন কানুন করে সীমান্তে কঠোরতা আনলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপন্নতা বাড়বে। এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত মোদী সরকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে এমনটা শোনা যায়নি। এখন এটাই প্রশ্ন দেশের গোধনের পাচার ঠেকানোর জন্য সরকার নতুন আইন করে সুরক্ষিত সীমান্তের নীতি প্রবর্তন করবে না পুরনো ফর্মুলা ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের লাইন নেবে? সব মিলে বলা যায় বাংলাদেশ নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে মোদী-সরকার। ■

বিজেপি-র মিশন-কাশ্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে বিজেপি। মুসলমান প্রধান রাজ্যে বিজেপি-র কোনোদিনই ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয় বলে বিরোধীরা এতদিন যে দাবি করে এসেছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কোনো ভিত্তি নেই বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। ৮৭ আসন বিশিষ্ট জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় যাদু-সংখ্যায় পৌঁছতে গেলে অন্তত ৪৪টি আসনে জেতা দরকার। ২০০৮-এ মাত্র ১১টি আসনে জয়ী হয়েছিল দল। এর মধ্যে লাদাখ ও কাশ্মীরের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। সবাই ছিলেন জম্মুর। কিন্তু সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে এই ছবিটাই আমূল পাল্টেছে। লাদাখ-সহ জম্মুর ৪১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২৭টিতেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। কাশ্মীরের ৪৬টি বিধানসভা আসনের একটিতেও বিজেপি এগোতে না পারলেও সামগ্রিকভাবে দলের ফল অত্যন্ত ভালো হয়েছে বলে নেতারা মনে করছেন। এই পরিস্থিতিতে গত ২৫ আগস্ট জম্মুতে এক দলীয় মিছিলে যোগ দেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। সম্প্রতি কাশ্মীরে এসে অরুণ জেটলি বলে গিয়েছেন, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকা বিজেপি-কে চার-পাঁচটা আসন দিলেই এই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে সরকার গড়তে পারবে দল। সব মিলিয়ে দলের এই দু' দুজন নেতার যথাক্রমে জম্মু ও কাশ্মীরে এসে এহেন মন্তব্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে ভারতবর্ষের এই অঙ্গরাজ্যকে এবার পাখির চোখ করেছে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি-বিরোধীরাও ছন্নছাড়া। কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন তাঁদেরই দলের মন্ত্রী শ্যামলাল শর্মা। তিনি সরাসরি রাজ্যে প্রথম হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীর দাবি তুলেছেন। কোনো কোনো মহল যদিও একে কংগ্রেসের হিন্দু তাস হিসেবেই দেখতে চাইছেন কিন্তু তাতে ভবি ভুলবার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এদিকে বিজেপি-র পক্ষে সুখের কথা অকাশ্মীরিয় মুসলমান ভোট বিশেষ করে জম্মুর গুর্জর ভোট ক্রমশ তাদের দিকে সরে আসছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীর সমস্যা আরও বাড়িয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক। গোটা কাশ্মীর উপত্যকাতেই যার প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। বিগত প্রায় মাস চারের যাবৎ বিজেপি-র পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে যাঁরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বোঝাচ্ছেন তাঁরা যাতে ভালো সংখ্যায় ভোট দেন। মূলত শ্রীনগরের আমিরা কাদাল ও হাব্বা কাদাল, বারামুল্লার সোপের এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রালের মতো কিছু এলাকাকে বেছে নিয়ে ভোট প্রস্তুতিকে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি-র এই অভাবনীয় উত্থানের পেছনে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠনের ভূমিকার কথাই সর্বাগ্রে স্বীকার করে নিচ্ছেন রাজনৈতিক মহল। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্গত কলেজগুলিতে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) দাপট প্রবল। পরিষদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রমেশ পাপ্পার নেতৃত্বে এই শতকের গোড়ায় এ রাজ্যে যে ছাত্রান্দোলন শুরু হয়েছিল আজ তার সুফল ফলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পরবর্তী সময় শ্রী পাপ্পা জম্মু-কাশ্মীরে সংগঠনের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পাবার পর আরও বেশি সময় রাজ্যের জন্য মনোনিবেশ করতে পারেন। ১৯৯০ সাল থেকেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে ঘর ছেলেছিলেন। এই মুহূর্তে আর এস এসের প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের ভাব ছড়ানোর যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল এবং এখনও যা জারি আছে তার সুফল এবার বিজেপি পাবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। একই সঙ্গে বিদ্যার্থী পরিষদের বর্তমান রাজ্য সভাপতি ড. বীরেন্দ্রর কৌণ্ডালের কথাও বলতে হয়। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এই অধ্যাপকটির গবেষণার বিষয় ছিল জম্মু-কাশ্মীর এবং হিমাচলপ্রদেশে গুর্জরদের পরিস্থিতি। ফলে

অভিবাসী ভোটের হিসেব

কেন্দ্র	নির্বাচকমণ্ডলী '০৮	অভিবাসী	উপস্থিত নির্বাচকমণ্ডলী
হাব্বা কাদাল	৪৯,৬৬৭	১৩,৩০২	৫,৭৫০
আমিরা কাদাল	৭৫,২৭৫	৩,০৫৮	১১,২৬৯
অনন্ত নাগ	৭৫,৪১০	২,৫৮১	৩১,৫০১
বিজডেরা	৭৫,৯৫৪	৪,০০০	৪৬,৭৫২
সৌপোর	৯০,২২৬	১,৬১৪	১৮,০১৭

রাজ্যের একাংশ অধিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর গবেষণাই তাঁকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে ও সেইমতো তাঁর ছাত্রসংগঠনকে আন্দোলনে যেতে সাহায্য করেছিল।

একইভাবে বলতে হয় দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কথাও। সারা রাজ্যের তাদের শাখা স্থাপন করার পাশাপাশি হাজার চারেক অঙ্গনওয়ারি কর্মীকে দলীয় সংগঠনে নথিভুক্ত করিয়েছে বলে খবর। জম্মু-কাশ্মীরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। বিশেষত মুসলমান প্রধান এলাকায় হিন্দু মন্দির পুনরুদ্ধারের কাজে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই সচেষ্ট তাদের কার্যকর্তারা। যেমন ২০০৫ সালে পুঞ্চ জেলায় বুদ্ধ অমরনাথে তীর্থযাত্রীদের যাত্রা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল পরিষদের পক্ষ থেকে। জঙ্গি উৎপাতের কারণে গত শতাব্দীর নয়ের দশকের মাঝামাঝি এই যাত্রা বন্ধ করে দিতে হয়। পরিষদের বর্তমান পরিকল্পনা মুসলমান প্রধান ভাদেরওয়া ও কিসতওয়ারে একটা যাত্রার আয়োজন করা। একইসঙ্গে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনেও উদ্যোগী হবার কথা জানা গিয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। রায়সী ও কৌসরনাগ থেকে যাত্রা সংঘটিত করার পেছনেও ভি এইচ পি-র নীরব ভূমিকা রয়েছে।

এ ব্যাপারে রাজ্য ভি এইচ পি-র পৃষ্ঠপোষক ও পেশায় আয়ুর্বেদ ডাক্তার রমাকান্ত দুবের নাম করতেই হয়। প্রবীণ এই মানুষটি আবাল্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে দীক্ষিত। দেশভাগের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাজ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আর জরুরি অবস্থার সময় তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন সেই কাজের কান্ডারি। তার এক সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সহ সভাপতি ও সভাপতির দায়িত্ব সামলে বর্তমানে মার্গদর্শকের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৫-এ জম্মু থেকে পুঞ্চের মাণ্ডি পর্যন্ত বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রার পুনরাম্ভর মূল মস্তিষ্ক ছিলেন ইনিই। ২০০৮-এ অমরনাথ যাত্রী ন্যাসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও তিনি। লেহ-তে ২০১০-এ যে মেঘ-বিস্ফোরণ হয় ও তার ফলে যে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয় তার সামলানোর প্রাথমিক দায়িত্বে ছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই। সব মিলিয়ে রাজ্যের জাতীয়তাবাদী চরিত্র এই মুহূর্তে বেশ স্পষ্ট বলেই মনে করা হচ্ছে। কাশ্মীরে বিজেপি মূলত যে নেতা-নেত্রীদের ভরসায় আছে তাঁদের ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবমূর্তি এই মুহূর্তে বেশ উজ্জ্বল। এরা হলেন ফৈয়াজ ভাট, ড. হিনা ভাট ও খালিদ জাহাঙ্গির। তাই এঁদের ভরসাতেই সম্মুখ সমরে বিজেপি।

হিসেব-নিকেশ

জম্মু :
বিধানসভা আসন—৩৭
২০১৪ লোকসভার নিরিখে : বিজেপি এগিয়ে ২৫টিতে।

কাশ্মীর :
বিধানসভা আসন—৪৬
২০১৪ লোকসভার নিরিখে : বিজেপি একটিতেও এগিয়ে নেই।

লাদাখ :
বিধানসভা আসন—৪
২০১৪ লোকসভার নিরিখে : বিজেপি এগিয়ে ২টিতে।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার (১৪২১)
প্রকাশ অনুষ্ঠান

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টা

ভারত সভা হল
কলকাতা

(ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল,
ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির বিপরীতে
বৌ-বাজার সেন্ট্রাল এভিনিউর সংযোগস্থলে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ভারতীয় চিন্তাধারাতেই কেবল, 'পরিশ্রমই প্রার্থনা' — এই ধরনের কথায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিজস্ব বাণীও ভারতের অল্প নয়। 'সংগ্রামই পূজা'— এই বাণী ছাড়া ভগবদ্গীতা জাতিকে আর কি শিক্ষা দিয়েছে? 'সর্বপ্রকার জ্ঞানই আনন্দদায়ক'— ভারতীয় ধর্মের এও একটি বাণী।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির সভা

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন অমিত পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সভা গত ১৪ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার 'একল ভবনে' অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সেই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ সতীশ মিত্তালজি এবং ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার সর্বভারতীয় কার্যকরী সম্পাদক বালমুকন্দজী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ নিখিলেশ গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও বিদ্বজ্জন। সভায় ডঃ নিখিলেশ গুহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং কার্যকরী সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন প্রদীপ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ সেন।

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভা

গত ৭ আগস্ট বাংলা আকাদেমিতে ডাঃ সুজিত ধর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়—**নবযুগের বার্তা : হিন্দুত্ব-২০১৪**

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বর্তমান সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুগামী ও ভগিনী-নিবেদিতা গবেষক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বৈদান্তিক দর্শনের প্রেক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দর্শন। ভারতের মাটিতে উদ্ভূত হিন্দু দর্শন। বর্তমানে এর বিপদ ঘরে-বাহিরে উভয় দিকেই। ঘরে সেকুলার ধারণা—আকবরের পাদোদক খাওয়ান হোত হিন্দুদের অথচ এ প্রথা কিন্তু মুসলমানদের জন্য নয়। বাংলাদেশ, কাশ্মীর, গোধরাতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চললেও সেকথা বলা চলবে না, কারণ মুসলমানেরা সংখ্যালঘু! এই অবধারণা ভ্রান্ত। বলা উচিত ভারতে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুরা মুসলমান। বহুমাত্রিক সমস্যা বিজড়িত ভারতের প্রয়োজন আগ্রাসী হিন্দুসমাজের।

স্বাগত সম্ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ডঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উল্লেখ করেন। ভারতে নবযুগের সূচনা করেন স্বামীজী। হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে শ্রী মিত্র বলেন, গোয়ার উপমুখ্যমন্ত্রী নিজেকে হিন্দু-খৃষ্টান বলে তাঁর যথার্থ পরিচয়ই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'হিন্দু-খৃষ্টান' বলে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জিকে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। বিদেশে ভারতীয়দের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই 'হিন্দু' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।'

টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ডীন স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ সভা পরিচালনা কালে বিগত সেমিনার এবং ডঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা, তরুণ গোস্বামীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, হিন্দুধর্মের ঔদার্য, সকলকে আপন করে নেওয়ার গুণ যত দিন থাকবে ততদিন ভারত মৃত্যুঞ্জয়ী। বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দুত্বের বাণী।

বিডি নিউজ টোয়েনটি ফোর ডট কমের প্রবীণ সাংবাদিক, বিবিসির ১৭ বছরের ব্যুরো চীফ পূর্ব ভারত শ্রীসুবীর ভৌমিক তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কিছু কথা তুলে ধরেন 'হিন্দুত্ব-২০১৪' প্রসঙ্গে। স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে পূর্ববঙ্গের এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিন্দুদের কথা। তাঁর মতে, হিন্দুদের অনেক সমস্যারই সমাধান হতে পারে হিন্দুরা যদি 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দু' হয়। ভারত সরকার এবং হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিরও চাই মেকি সেকুলারি ছেড়ে ধর্ম, জাত-পাত না দেখে উৎপীড়কদের কড়া হাতে দমন করা নতুবা নবযুগের বার্তার ভুল পাঠ আমরা করব।

'ভারত আমার ভারতবর্ষ' গেয়ে শোনালেন সংস্কার ভারতীর সুভাষ ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফাউন্ডেশনের অন্যতম ট্রাস্টি অজয় কুমার নন্দী।

কুইজ প্রতিযোগিতা

গত ২৭ আগস্ট, ২০১৪ বুধবার বিধাননগরের হরিয়ানা বিদ্যামন্দিরের সভাগৃহে আয়োজিত হল ভারতবিকাশ পরিষদ, বিধাননগর শাখার উদ্যোগে 'ভারত কো জানো' কুইজ প্রতিযোগিতার শেষ পর্ব। পাঁচটি বিদ্যালয়ের কুড়ি জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হন যথাক্রমে হরিয়ানা বিদ্যামন্দির এবং ভারতীয় বিদ্যাভবন। সঞ্চালক ও কুইজমাস্টার ছিলেন মিহিরবরন কর এবং সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে বেদমন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে আরম্ভ হয় অনুষ্ঠান। সভাপতি নৃপেন্দ্র আচার্য উপস্থিত শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন রাখেন যেন ছাত্র সমাজ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করে ভারতের সংস্কৃতি ও

ফঃ ৫

চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস উদযাপন

পাকিস্তানি খান সেনাদের হাতে ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট প্রাণ দিতে হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কিশোর স্বয়ংসেবক চুড়কা মুর্মুকে। নিজের গ্রাম ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার তাগিদেই নিজের জীবনকে বাজি রাখতে পিছপা হয়নি বছর আঠারোর চুড়কা মুর্মু। আর সেই থেকেই প্রতিবছর ১৮ ও ১৯ আগস্ট চুড়কা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে। বলিদান দিবস পালন করা হয়। কবাডি, তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা দুঃস্থ ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যের মধ্যে দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়। এবারের অনুষ্ঠানে একটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়, তাহল চুড়কা মুর্মুকে 'শহীদ' হিসাবে ঘোষণা করার দাবি। প্রায় ৪৩ বছর আগে কয়েকশো খান সেনা সীমানা লাগোয়া বালুরঘাটের চমরাম প্রসাদ গ্রাম আক্রমণ করে। জয়চাঁদলাল প্রগতি বিদ্যাচক্র স্কুলের এই একাদশ শ্রেণীর ছাত্রটি খান সেনাদের আটকাতে বিএসএফ-কে সাহায্য করতে গিয়ে প্রাণ দেয়। দেশের জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু বহুবছর কেটে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। এই শহীদের প্রতি সম্মানও সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে আটকে আছে। কিন্তু সঙ্ঘের তরফ থেকে এই দিনটি পালন করা হয় বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে। আর তখন থেকেই তাঁকে শহীদের মর্যাদা দিতে তৎপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এবছর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদয় শঙ্কর সরকার, যোগেন মাহাত, বুদ্ধদেব মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা। স্থানীয় ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলিদান দিবস পালন করা হয়।

সভ্যতার উপাদানে নিজেদের চরিত্র ও জীবন গঠন করেন। এই সুরটির মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সুন্দর একটি ম্যাজিক শো'র নিবেদন কারণ প্রখ্যাত জাদুকর শ্রী প্রিন্স শীল এবং তাঁর সহশিল্পীরা।

দিল্লিতে বাংলাভাষীদের প্রান্ত প্রমুখ

সম্প্রতি দিল্লির সঙ্ঘকার্যালয় কেশবকুঞ্জে সহ-সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপালজীর উপস্থিতিতে এক বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে অহিন্দী ভাষাভাষী অর্থাৎ তামিল, কন্নড়, তেলুগু, মালয়ালম, ওড়িয়া, গুজরাতি, অসমিয়া ও বাংলা—মোট ৮টি রাজ্যের স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বাংলার প্রান্ত প্রমুখ হিসাবে প্রবীর মুখার্জির নাম ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, দিল্লিতে তিনি স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধিও।

ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় ক্রীড়ানীতি

গত ২ ও ৩ আগস্ট ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির বৈঠক নাগপুরের রেশমবাগের স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়াভারতীর উপসমিতির সদস্যরাও এই বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন। ক্রীড়ানীতি নিয়ে বৈঠকের দায়িত্বে ছিলেন সাংলীর (মহারাষ্ট্র) দীপক লেলেজী। এক চাকা সাইকেল চালনায় পারদর্শিতার জন্য দীপকজীর নাম গিনিস ওয়ার্লড বুকে উল্লেখিত আছে। তাঁর পরিচালনায় সাংলীর লেজিমও গিনিস বুকে স্থান পেয়েছে।

প্রচুর গবেষণা করে দীপকজী যে সুচিন্তিত ক্রীড়ানীতি প্রস্তুত করেছেন সেটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিবরণসহ সকলের সামনে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ চেতন চৌহান, সর্বভারতীয় উপাধ্যক্ষ নারায়ণ সিং রাণা, দিল্লির রাকেশ গোস্বামী, দক্ষিণবঙ্গের তপনমোহন চক্রবর্তী, রতলামের চৈতন্য কাশ্যপ, জয়পুরের গোপাল সৈনী, ওয়ার্ধার সঞ্জয় লোখন্ডে, মুম্বই-এর ভারতী তাই প্রমুখ। দক্ষিণবঙ্গের ক্রীড়া ভারতীর মন্ত্রী তপন গাঙ্গুলিও তাঁর প্রস্তাব লিখিতাকারে পেশ করেন। সবার মতামত পর্যালোচনা করে একমাসের মধ্যে এই খসড়া ক্রীড়ানীতির পরিপূর্ণ রূপরেখা তৈরি করার জন্য লেলেজীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটি প্রস্তুত হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রীড়াভারতীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

দক্ষিণবঙ্গ ক্রীড়াভারতীর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে 'নির্ভয় মহিলা, সক্ষম মহিলা' এই নীতি কার্যকর করার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মীরাট থেকে পুনম বিষই আসবেন এবং বিভিন্ন স্থানে চার-পাঁচটি ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ক্যাম্প করবেন। দক্ষিণবঙ্গের ক্রীড়াভারতীর নিয়ামকমণ্ডলীতে দুজন মহিলা সদস্য আছেন জেনে সর্বভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির ভারতী তাই ও অন্যরা সন্তোষপ্রকাশ করেন। দক্ষিণবঙ্গে ক্রীড়া ভারতী ধীরে ধীরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে এবং বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন জায়গায় ক্রীড়াকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, স্কুলে স্কুলে ক্রীড়া জ্ঞান পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, কুইজ প্রতিযোগিতা ছাড়াও কবাডি, যোগাসন, খো খো এবং ফুটবল প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে।

ক্রীড়া ভারতীর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান

সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়া ভারতীর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল

কাঁথি হাইস্কুলের সভাকক্ষে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অর্জুন পুরস্কার ও পদ্মবিভূষণ পুরস্কার প্রাপ্ত অলিম্পিকের রাইফেল শ্যুটার ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিজের অতীত জীবনে সাফল্যের দিক এবং সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে গেলে কতটা সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় সেই দিকটা তুলে ধরেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন কাঁথি হাই স্কুলের ক্রীড়া বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক তথা ক্রীড়া ভারতীর কাঁথি শাখার সভাপতি ভবদেব ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানে যোগাসনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীদের 'ধ্যানচাঁদ সম্মান', তাঁদের পিতামাতাদের 'বীর জীজামাতা সম্মান' এবং দুই প্রশিক্ষক সুকুমার প্রধান এবং ডাঃ আলোক পালকে 'দ্রোণাচার্য সম্মান'-এ সম্মানিত করা হয়। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ভবদেব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সাহায্য সহযোগিতা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই হল ক্রীড়া ভারতীর মূল লক্ষ্য। তাই সারা বছর নানান কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ চলবে। তবে সম্মান প্রাপকগণ ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই-এর হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে খুশি। তাদের বাবা-মায়েরা জানিয়েছেন, আজ পর্যন্ত সবাই আমাদের সন্তানদের সম্মান দিয়েছে কিন্তু আমাদেরকে এত বড় একজন মানুষের হাত থেকে তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দেবাশিস রায়, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সম্পাদিকা রীতা ভুঞ্যা প্রমুখ।

আন্দামানে ক্ষেত্র প্রচারকের প্রবাস

গত ২ আগস্ট থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত'জীর প্রবাস সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হোল। এই ১০ দিনে গণ্যমান্য সহ সমাজের সর্বস্তরের প্রায় ৫০০ জন মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গত ৩ আগস্ট শ্রী গুরুপূর্ণিমার সমারোপ কার্যক্রম প্রায় ২৫০ জন স্বয়ংসেবকের উপস্থিতিতে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, তারপর ৪, ৫, ৬, ৭ আগস্ট পোর্ট ব্লেয়ারে সঙ্ঘপরিবারের সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে তিনি আগামী দিনে সঙ্ঘের শক্তি এবং শাখা বৃদ্ধির জন্য পথ নির্দেশ করেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, সঙ্ঘ আজ সমাজে অচ্ছুত নয়। এক বিশেষ যোজনায় এখানকার প্রশাসনিক সর্বোচ্চস্তরের অধিকারীদের সঙ্গে আন্দামানের বিকাশ তথা দেশের বিকাশের জন্য ক্ষেত্রপ্রচারকের বার্তা বিনিময় খুবই ফলপ্রসূ হয়। তাঁরা নিয়মিত সঙ্ঘ অধিকারীদের সঙ্গে চর্চারও প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য দ্বীপে প্রবাস ও রক্ষাবন্ধন উৎসব সুন্দরভাবে পালন হয়। এর মধ্যে রঙ্গত ও ডিগলিপুরের কার্যক্রম খুব ভালোভাবে হয়। ডিগলিপুরের প্রবাস সমাপ্ত করে তিনি ১০ আগস্ট স্থলপথে প্রায় ১০ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করেই পোর্টব্লেয়ারের রাখিবন্ধন উৎসবে উপস্থিত হন। সেখানে স্বয়ংসেবক সহ ১০০ জন নাগরিকের উপস্থিতি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন দ্বীপসমূহের কৃষ্টি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ গবেষক এ. কে. সিং। এছাড়া নগর সঙ্ঘচালক এবং জিলা সঙ্ঘচালকও উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে আন্দামানে সঙ্ঘ ছাড়া বিবিধ ক্ষেত্রের ১০টি সংগঠন কাজ করছে। সঙ্ঘের শাখা দক্ষিণ আন্দামান এবং উত্তর মধ্য আন্দামানে ২৮টি চলছে। নিকোবর আপাতত সম্পর্কিত স্থান। এক কথায়, আন্দামান দ্বীপসমূহে হিন্দুত্বের হাওয়া খুব ভালোভাবে বইতে শুরু করেছে।

রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির গুরুদক্ষিণা উৎসব

৬ আগস্ট বারাসাত দক্ষিণপাড়ায় কণিকা সাহার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গুরুদক্ষিণা উৎসব। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ জন সেবিকা বোন, যারা প্রায় সকলেই স্কুল ও কলেজের ছাত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী এবং গুরুদক্ষিণা উপলক্ষে ভাষণ দেন আরতি নন্দী।

সাঁওতাল সম্মেলন

গত ১৭ আগস্ট ধর্মজাগরণ মঞ্চের তত্ত্বধানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার কানুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় দু'দিন ব্যাপী সাঁওতাল সম্মেলন। ১৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। গুরুমা রেখা হেমরম ও ধর্মজাগরণের প্রান্ত সংযোজক গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু সাঁওতালী ভাষায় হিন্দু ধর্মের মধ্যেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বেড়ে ওঠার কথা বলেন। প্রধানত এই দুই জনের উদ্যোগেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন গণেশ হাঁসদা (চালসা, জলপাইগুড়ি) সঞ্জনা মারান্ডি (উত্তর দিনাজপুর), নারায়ণ সোরেন (কিষাণগঞ্জ) ও দেওয়ান মার্ডি প্রমুখ। ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, অমরেশ দত্ত, কৃষ্ণ কুমার দাস ও অলোক দাস সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সদস্যদের উৎসাহিত করেন।

মালদায় দুঃস্থ ছাত্রদের পাশে প্রাক্তন ছাত্ররা

অবক্ষয়ের কর্দমে মূল্যবোধের পদ্মরূপে ফুটল মালদহ শহরের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা। এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ২০০২ সালের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চবিদ্যালয় থেকে পাশ করা প্রাক্তনীরা গড়ে তুলেছে 'আভা এ রে অব হোপ।' ইতিমধ্যে আভায় যোগ দিয়েছেন প্রায় ৬০ জন প্রাক্তন ছাত্র, যাঁরা আর কোনো না কোনোভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। ওই ছাত্ররা একটা সময় দেখেছে তাঁদের ক্লাসের বহু ছাত্রের দারিদ্র্যের চিত্র। দেখেছে পড়াশোনার জন্য সংগ্রাম। তাই ওরা নিজের আয়ের টাকা সংগ্রহ করে ললিতমোহন শ্যামমোহিনী'র বর্তমান দুঃস্থ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়াল।

আভা'র সদস্য শ্রেয় সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, গত ২০ আগস্ট তাঁরা বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দশক শ্রেণীর ১২ জন দুঃস্থ ছাত্রের হাতে ২০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন। যদিও পড়াশোনার ক্ষেত্রে ওই টাকা যৎসামান্য। তবুও ওদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে আভা'র এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বুধবার বিদ্যালয় শুরুর আগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রাক্তন ছাত্ররা দুঃস্থ ছাত্রদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেন। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সুব্রত মজুমদার এই প্রয়াসকে অভূতপূর্ব বলে মন্তব্য করেন। 'আভা'-র পৃষ্ঠপোষক এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ এই কাজে আরও বেশি করে প্রাক্তন ছাত্রদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মঙ্গলনিধি

গত ১০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের স্বয়ংসেবক বদ্রীপ্রসাদ মজুমদারের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর পিতা শচীন্দ্রনাথ মজুমদার ও মাতা সুমিতা মজুমদার দশ হাজার টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায়চৌধুরির হাতে। এই কার্যক্রমে প্রবীণ প্রচারক কেশবজী নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করেন। উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ প্রচারক করুণা প্রকাশ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দিলীপ ঘোষ, স্বরূপ দত্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর, মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, শিলিগুড়ি বিভাগ প্রচারক বাদল দাস, জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালি-সহ জেলা কার্যকর্তা ও স্থানীয় স্বয়ংসেবকেরা। অনুষ্ঠানে প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শোকসংবাদ

গত ২৮ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ অজিত প্রামাণিকের মাতৃদেবী সরস্বতী প্রামাণিক কলিগ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। তিনি ৪ পুত্র ও পুত্রবধূ, ৩ কন্যা ও নাতি নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর সব পুত্রই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

ধ্যানচাঁদকে যথার্থ মর্যাদা দিচ্ছে ক্রীড়াভারতী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্যানচাঁদ শুধু ভারত গৌরব নন, তিনি বিশ্বরত্ন। একটা খেলা সর্বোপরি একটা জাতিকে তিনি বিশ্বমঞ্চে গৌরবের আসনে বসিয়েছেন। তাই তো তাকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি সর্বকালের সেরা দশ অলিম্পিক ব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট উপরের দিকেই স্থান দিয়েছে। দেশের সরকার এমনকী তিনি যে খেলাটি খেলেছেন সেই হকির জাতীয় সংস্থাও তাকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেয়নি। সরকার অবশ্য তার জন্মদিনটি জাতীয় ক্রীড়াদিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ওইটুকুই, বিশেষ কোনো কর্মসূচিও নেওয়া হয় না বা তাঁর ক্রীড়াগত আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে না। তবে সরকারি স্তরে না হোক, সর্বভারতীয় বেসরকারি ক্রীড়াসংগঠন ক্রীড়াভারতী কিন্তু এই চিরস্মরণীয় ক্রীড়াশিল্পীকে যথোচিত গুরুত্ব ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে নানা উপাচারের মাধ্যমে। দেশজুড়ে ক্রীড়াভারতী তাঁর জন্মদিনে (২৯ আগস্ট) নানারকম ক্রীড়া ও শরীরচর্চার প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী আয়োজন করে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে।

এবারে আসা যাক ধ্যানচাঁদের ক্রীড়াদ্যুতি নিয়ে দু-চার কথা বলার দুরূহ কাজটির নিমিত্তে। চারটি অলিম্পিয়াডে ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ভিকট্রি পোডিয়ামের শীর্ষে ওঠার দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী। এই তথ্য সকলেরই জানা। খেলা ছাড়ার পর ভারতীয় হকি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তা হিসেবে নতুন নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছেন তাও কারুর অজানা নয়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ধ্যানচাঁদকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। গান্ধীজী অনেক সভা-সমিতিতে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেছেন ও বিদেশের মাঠে তাঁর ও ভারতীয় হকি দলের বহুমাত্রিক এবং বীরত্বব্যঞ্জক হকি শৈলীর কথা বলে উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর যোদ্ধাদের। বীর সাভারকর তাঁর বড় ভক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্র পাঞ্জাবের বহু বিপ্লবী তাঁর খেলা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বিপ্লবের দিশা খুঁজে পেয়েছে।

কেউ কি জানেন যে চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে সারা বিশ্ব পাগল, সেই চ্যাপলিন তাঁর কতবড় ভক্ত ছিলেন? ১৯৩২ এর লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের পর বিজয়ী ভারতীয় দলকে নিয়ে উন্মাদনা চরমে পৌঁছয় আমেরিকায়। অনেকটা স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের জনসম্মোহনী বক্তৃতার পর যা হয়েছিল প্রায় সেরকম আর কি। চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, ক্লার্ক গ্রেবল, ভিভিয়ান লের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীরা ভারতীয় দলের ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তকে ধরলেন ও অনুনয় বিনয় করে রাজি করালেন তাদের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য। খেলার উপলক্ষ্য ছিল ধ্যানচাঁদ, রূপসিংহ, দারার মতো থ্রি মাস্কোটিয়ার্সের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

ক্রিকেট কিংবদন্তী ডন ব্রাডম্যান বহুদূর থেকে ছুটে এসেছিলেন তাঁর অটোগ্রাফ নেবেন বলে। ঘটনাটি ১৯৩৫ সালে, ভারতীয় দল তখন অস্ট্রেলিয়া সফররত। এডিলেডে খেলার পর লর্ড মেয়রের পার্টিতে নিমন্ত্রিত ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিশেষ করে ধ্যানচাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই ছুটে আসেন ব্যাডম্যান। আর শুধু কি তাঁরাই,৪৮-০ লন্ডন অলিম্পিকের আসরে স্বয়ং রানী এলিজাবেথ পর্যন্ত সমস্ত রাজকীয় প্রোটোকল ভেঙে রয়্যাল বক্স থেকে নেমে এসেছিলেন তাঁর স্টিকে জাদু আছে কিনা পরীক্ষা করতে। সেবার অবশ্য ধ্যানচাঁদ গেছিলেন বিজয়ী ভারতীয় দলের পরামর্শদাতা হয়ে। ফাইনালের পরদিন ভারত ও অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের প্রীতি ম্যাচে ধ্যানচাঁদকে জোর করে মাঠে নামিয়ে দেন পঙ্কজ গুপ্ত সমেত অন্যান্য কর্মকর্তারা।

যথারীতি মরা হাতি লাখ টাকার মতো চিরন্তন প্রবাদটি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল ৪৩ বছরের ধ্যানচাঁদের স্টিকে। বুড়ো ধ্যানচাঁদের গতি কমলে কি হবে শিল্প-সুষমামণ্ডিত স্টিকের কারুকার্যে এতটুকু মরচে পড়েনি। দেখে চমকে উঠেছিলেন ইংল্যান্ডেশ্বরী তাই চোখ কচলে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় যাদুঘরে এবং ধ্যানচাঁদের স্টিক উল্টে পাল্টে দেখেছিলেন তাতে কোনো জাদুস্পর্শ আছে কিনা। বিদেশি সংবাদমাধ্যম তাকে অ্যাঞ্জেল বা 'দেবদূত' বলে অভিহিত করেছিল। প্রায় ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজীবনে দুনিয়ার সর্বত্র বীরপুজো পেয়েছেন, স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন অজস্র। বিদেশের বহু স্থানে রাস্তার, স্টেডিয়ামের নামকরণ হয়েছে। অনেক স্টেডিয়ামের সামনে তাঁর মূর্তি রয়েছে। অথচ আমাদের সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়েই হাত ধুয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি দিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়াম করা হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসের সময় হকি খেলতে এসে বিদেশি দলগুলি ওই স্টেডিয়ামে খেলার সুযোগ পেয়ে আবেগ প্লাবিত হয়ে পড়েছিল। বিদেশিদের কাছে এখনও ধ্যানচাঁদ কতটা সম্মানীয় ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত তা ওই কমনওয়েলথ গেমসের সময় বেশ বোঝা গেছে। তাই স্বদেশে প্রত্যাশিত মর্যাদা না পেলে কি হবে, বিদেশে তিনি সর্বত্র পূজ্যতে।

শব্দরূপ-৭২২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

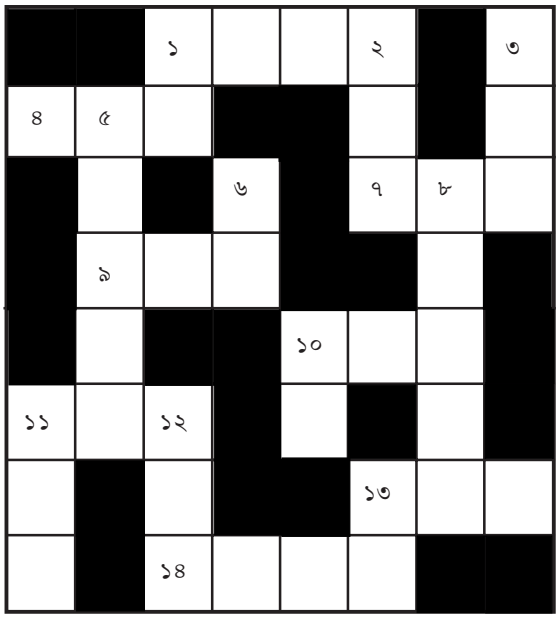

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবিশেষ, **৪.** সুন্দর দন্তবিশিষ্টা, **৭.** বাঁদর, কপি, শাখামৃগ, **৯.** সর্প, **১০.** 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যরচয়িতা কবি, **১১.** কৃষ্ণসহচর গোপবালক, **১৩.** 'পাখিসব করে রব, রাতি পোহাইল/—কুসুমকলি সকলি ফুটিল', **১৪.** বিশ্রবামুনির পত্নী ও কুবেরের জননী।

উপর-নীচ : ১. দক্ষ কন্যা, ভগবতী, **২.** নেলসন ম্যান্ডেলা-র ডাকনাম, **৩.** দোলপূর্ণিমার পূর্বরাত্রে আগুন জ্বালিয়া খেলা, মেড়াপোড়া, **৫.** পরদার আড়ালে, **৬.** যজ্ঞ, **৮.** কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিশেষ, **১০.** বাংলা সনের পঞ্চম মাস, **১১.** শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী, অর্জুনের পত্নী, **১২.** ভাই বা বোনের শাশুড়ি, **১৩.** বধির শ্রীকৃষ্ণ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	আ	শু	তো	ষ	■	পু
বা	লা	ম	■	■	ন্মা	■	ল
■	ল	■	ম	■	স	মূ	হ
■	মো	চ	ন	■	■	ল	■
■	হ	■	■	তে	ভা	গা	■
মে	ন	কা	■	লো	■	য়ে	■
ও	■	ণী	■	■	বি	ন	তা
য়া	■	ন	ন্দ	ঘো	ষ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭২২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দাবৈরাগী ।। ৫

জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার অপরূপ মেলবন্ধন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২১

● দেবীপ্রসঙ্গ : দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা — **স্বামী অরুণানন্দ**
● দিব্যজীবন : গৌরীমা — **সবুজকলি সেন**

উপন্যাস

● **শেখর সেনগুপ্ত** — তন্ত্রাচার্যের ডায়েরি ● **সুমিত্রা ঘোষ**— জল রংয়ে আঁকা ছবি মুছে যায়
● **সৌমিক ঘোষ**— হীরের আংটি

প্রবন্ধ

● **রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী** — ইসলামে নারীর স্থান : আফজল খাঁ ও ৬৩ জন বিবির হৃদয়বিদারক উপাখ্যান
● **অচিন্ত্য বিশ্বাস** — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান ● **তথাগত রায়** — কেন এই ধর্ষণবন্যা?
● **প্রণব চট্টোপাধ্যায়**— সার্ধশতবর্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : ঐতিহ্য, আধুনিকতা, বিজ্ঞান সাধনা ও স্বদেশ চেতনা
● **রবিরঞ্জন সেন** — হিন্দুত্বের রক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ● **সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**— ভারতীয় চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ
● **গোপাল চক্রবর্তী**— কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের উত্থান ও পতন ● **তুষারকান্তি ঘোষ** — হিন্দুধর্ম ও বর্তমান বিশ্ব
● **অরিন্দম মুখোপাধ্যায়**— বাংলা-ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ● **গোপেশচন্দ্র সরকার**— যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় জমান্তরবাদ তত্ত্ব ● **অর্ণব নাগ**— বই বৈ তো নয় ● **সৌমেন নিয়োগী**— আজিবক তীর্থ— বরাবর ও নাগার্জুনই পাহাড়
● **বাসুদেব ধর**— বিপন্ন ঐতিহ্য, বিপন্ন সভ্যতা ● **দেবীপ্রসাদ রায়**— আমাদের সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থতা।

বিচিত্র রচনা

● **তাপস অধিকারী**— চড়াই তুমি ভালো থেকো ● **সুন্দর মৌলিক** — স্টেশনের কথা।

জীবনকথা

● **বিজয় আঢ্য**— এক অপরাজেয় যোদ্ধা।

গল্প

● **রমানাথ রায়**— শেষ বয়সের গল্প ● **শেখর বসু**— সেকেলে ডাকাতের নীতি ● **গোপালকৃষ্ণ রায়**— ধাই মা
● **জিষ্ণু বসু**— সাদা হাতি কালো মাহুত ● **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়**— ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো
● **সৌমিত্র দাশগুপ্ত**— ইয়েসস্যার ● **সুনীল আচার্য**— আর্তদিন ● **মেখলা মিত্র**— ভ্যানিসিং পাউডার।

রম্যরচনা

● **চণ্ডী লাহিড়ী**— নিজের রাজ্য, নিজের বাঙালি।

এছাড়াও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ।

সবমিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো
একটি সংরক্ষণযোগ্য পূজা সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।। মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।। দাম : ৭০ টাকা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
8 September - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from

EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা